তৃতীয় অধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবীর পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের রূপরেখা

বাংলা উপন্যাসের সূচনালগ্ন ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। যদিও বাংলা গদ্যসাহিত্য চর্চার আরম্ভ ও বিকাশ অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই তরান্বিত হয়েছিল। কিন্তু উপন্যাস খুব কমসময়ের মধ্যে পুরাতন কাব্য ও নাট্য শাখার তুলনায় অনেক বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। আমাদের প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হয় যে, বাংলা গদ্যের বিকাশ ও ব্যপ্তি ঘটার ফলেই উপন্যাসের আবির্ভাব। কিন্তু যখন মানুষের মধ্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ নব জাগরিত মন্ত্রের মতো ক্রমানুসারে জাগ্রত হয়ে উঠেছে; সেইসময়ে উপন্যাস নিজস্ব স্বতন্ত্ররূপ লাভ করেছিল। যেভাবে বাংলা গদ্যচর্চা শুরুর মধ্য দিয়ে উপন্যাস রচনার সলতে পাকানো শুরু হয়েছিল। সেইধারাই পরবর্তীকালে ‘প্যারীচাঁদ’, ‘ভূদেব মুখোপাধ্যায়’ ও ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’-এর সময়ে এসে প্রদীপ প্রোজ্জ্বলণ ঘটায়। অবশ্য তারও বহুআগে থেকেই একটা দীর্ঘসময় জুড়ে বাংলা ভাষায় অনেকেই উপন্যাস রচনার প্রয়াস করেছিলেন। সার্থকতার নজীর ছিল না, কিন্তু ‘ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়’ থেকে ‘হেনা ক্যাথারিন ম্লুয়েন্সের’ নাম এক্ষেত্রে স্মরণ করতে পারি। কারণ ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ যে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন তার পেছনে পূর্বজ সাহিত্যিকদের অবদান কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না। ছোট ছোট অনেকগুলি জলের কণা যেমন করে মহাসাগরের সৃষ্টি ও ব্যাপ্তির কারণ, ঠিক তেমনি ‘বঙ্কিমচন্দ্রের’ আদর্শ উপন্যাস রচনার পেছনে অনেক সাহিত্যিকদের অবদান স্বীকার করে নিতে হয়। আর

একটি বিষয় বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন যে, প্রথম পর্যায়ে যাঁরা উপন্যাস রচনা করছিলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ ঔপন্যাসিক ছিলেন পুরুষ, নারী ঔপন্যাসিক ছিলেন হাতে-গোণা দু'একজন। প্রথম নারী ঔপন্যাসিক হিসেবে আমরা 'হেনা ক্যাথারিন ম্লুয়েন্স'-এর নাম স্মরণ করতে পারি। তাঁর 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' রচনাটির সার্থকতা তেমন নেই কিন্তু ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। রচনাটির প্রকাশকাল ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ। 'আশাপূর্ণা দেবী' একজন মহিলা ঔপন্যাসিক, তাঁর পূর্ববর্তী মহিলা ঔপন্যাসিক হিসেবে 'হেনা ক্যাথারিন' বিখ্যাত। অবশ্য প্রথম দিকের উপন্যাস নিয়ে সমালোচকদের নানারকম মন্তব্য আছে। সমালোচক 'সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়' লিখেছেন–

"ইতিহাসের যে ন্যায়সূত্রের অমোঘ নির্দেশে ইংল্যাণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীতে উপন্যাসের জোয়ার, তারই কিঞ্চিৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের সামাজিক বিন্যাসেও বিদ্যমান ছিল এরকম ভাবা হয়ে থাকে। বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্নের ইতিহাসটি আমাদের উপন্যাসের গতি প্রকৃতি এবং শক্তি দৌর্বল্য উপলব্ধির জন্য বিশেষ ভাবে অনুধাবনীয়"।[১]

উদ্ধৃত উক্তির প্রেক্ষিতে 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' থেকে 'আশাপূর্ণা দেবীর' সময়কাল পর্যন্ত যাঁরা উপন্যাস লিখেছেন তাঁদের নাম বিশেষভাবে স্মরণ করা যায়। অবশ্য একেবারেই শুরুর দিকে 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়' রচিত 'নববাবুবিলাস'(১৮২৩) গ্রন্থটি সাহিত্যজগতে উপন্যাস রচনায় সলতে পাকানোর কাজ করেছে। 'হেনা ক্যাথারিন ম্লুয়েন্সের' পরবর্তীকালে 'প্যারীচাঁদ মিত্রে'র 'আলালের ঘরের দুলাল'(১৮৫৮) সমালোচকমহলে বহুভাবে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। এরপরে 'ভূদেব মুখোপাধ্যায়' রচিত 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'(১৮৫৭) প্রকাশিত হলে সেই সমালোচনার জগতে নতুন করে ঘৃতাহুতি পরে। যার ফলে সার্থক উপন্যাসের অপেক্ষায় দিন গুনতে থাকে বাঙালি পাঠক সমাজ। তবে 'বঙ্কিমচন্দ্রের' পূর্বে বাংলা উপন্যাস রচনার প্রয়াস যাঁরা করেছেন

তাঁরা প্রণম্য, কারণ কোন কিছুর শুরু করাটাই হল সব থেকে কঠিন কাজ। সমালোচকের মতেই বলা চলে –"উপন্যাসের জন্ম ইতিহাসে ভবানীচরণের নকশা, ম্লুয়েন্সের পারিবারিক চিত্র, প্যারীচাঁদের আলাল, ভূদেবের অঙ্গুরীয় বিনিময় এবং কৃষ্ণকমলের দুরাকাঙ্ক্ষার ভূমিকা আছে"[২]। অন্যভাবে বলা যায় 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের' উপন্যাসে অগ্রজদের অনুসরণ নেই, কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আগামী দিনের পথ দেখানোর আলোকশিখা আছে।

উপন্যাসের বিষয়ের মধ্যে মানুষের প্রণয় অথবা দাম্পত্য সম্পর্কের প্রসঙ্গ থাকবে সেকথা স্বাভাবিকভাবে মনে করা যেতে পারে। ঔপন্যাসিক দাম্পত্য জীবনের প্রসঙ্গ কিছুটা হলেও উপন্যাসের মধ্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। তাই উপন্যাস সৃষ্টির প্রথমলগ্ন থেকেই ঔপন্যাসিকদের রচনায় অন্যতম বিষয় হিসেবে দাম্পত্য সম্পর্কের নানাতর উত্থান-পতনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' রচিত প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'(১৮৬৫) থেকে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর প্রথম উপন্যাসে রোমান্সের প্রভাব আছে বলে অনেক সমালোচক মন্তব্য করেন। উপন্যাসটিতে যতটা ইতিহাসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ততটা সমাজের বাস্তবতাকে তুলে ধরা হয়নি। মানুষের জীবনের সম্পর্কের থেকে সমস্যাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে যেভাবে রোমান্সের প্রতিফলন ঘটেছে তাতে করে দাম্পত্য সম্পর্কের বিবরণ খুব বেশী একটা নেই। পরবর্তীকালের উপন্যাসগুলিতে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দাম্পত্য ঘনীভূত হতে হতেই ঘটনার মোড় নিয়েছে অন্যদিকে। 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' উপন্যাসদুটি বাদ দিলে বাকি উপন্যাসগুলি সামাজিক উপন্যাস হিসেবে ব্যাখ্যা করা চলে। মূলত প্রেম ও সামাজিক নীতিবোধ উপন্যাসগুলিতে দ্বন্দ্ব আকারে প্রকাশ পেয়েছে। 'বিষবৃক্ষ'

উপন্যাসে ‘নগেন্দ্রনাথ’ ও পরমা সুন্দরী ‘সূর্যমুখীর’ দাম্পত্য সম্পর্ক প্রথমাবধি কোনভাবে রাহুর কালো ছায়াগ্রস্থ ছিল না। কিন্তু তার নিজের পোঁতা বিষবৃক্ষে একদিন তার দাম্পত্য সম্পর্কে ফাটল ধরে ভেঙে যায়। ‘কুন্দনন্দিনী’ নামে সেই বিষবৃক্ষের সঙ্গে একদিন ‘নগেন্দ্রনাথের’ বিবাহ হয়, এবং অসুখীদাম্পত্য জীবনের কারণে ‘কুন্দনন্দিনী’ আত্মহত্যা করে। তারপরে আবার পুতুল খেলার মতো ‘নগেন্দ্রনাথের’ সঙ্গে ‘সূর্যমুখী’ দাম্পত্য সম্পর্কে জড়িয়ে পরে, কিন্তু সে বন্ধনে কোনো মনের মিল ছিল না। ট্রাজেডির মৌন হাহাকারে দুজনের মধ্যে চিরকালের জন্য একটা অদৃশ্য পার্থক্য তৈরি হয়। সুখী দাম্পত্য জীবন কিভাবে একটু ভুলের জন্য নষ্ট ও অসুখী সম্পর্কে পরিণত হয় ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাস তারই চিহ্নবাহক। অন্যদিকে ‘চন্দ্রশেখর’ উপন্যাসে ‘শৈবালিনী’ যেভাবে নিজেই রচনা করতে চেয়েছেন প্রকৃত প্রণয় থেকে দাম্পত্য জীবন, তাতে একদিকে তার হারাতে হয়েছে বিবাহিত স্বামী ‘চন্দ্রশেখর’কে, অন্যদিকে নিয়তির অমোঘ নির্দেশে প্রতাপকে। কোন দিকেই কোনভাবেই তার দাম্পত্য সম্পর্ক স্থায়িত্ব পায়নি। ‘রজনী’ উপন্যাসটি ব্যতিক্রমী কারণ এখানে ‘লবঙ্গলতা’ ও ‘অমরনাথের’ অসামাজিক প্রেমের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন একটি অসামাজিক দাম্পত্য সম্পর্ককে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি ‘শচীশ’ ও ‘রজনীর’ মধ্যে রোমান্টিক প্রণয়ের স্বার্থকতার মধ্য দিয়ে সুখী দাম্পত্যের চিত্র অঙ্কন করেছেন ঔপন্যাসিক। ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ উপন্যাসটি দাম্পত্য সম্পর্কের একটি গূঢ়তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সফল হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। ‘গোবিন্দলাল’ অধীর হয়ে যৌবনাকাঙ্খার দায়ে শুধুমাত্র কামভাবকে প্রাধান্য না দিয়ে, তার স্ত্রী ‘ভ্রমরকে’ পরিত্যাগ করে রূপবতী ‘রোহিণী’কে গ্রহণ করে। কিন্তু একসময় সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে কাম-তৃষ্ণার পৃষ্ঠপোষক ‘রোহিণী’কে নিজের হাতেই ধ্বংস করতে চায়। আর স্বামীর অবহেলার কারণে ‘ভ্রমর’ আত্মহত্যা করে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে দাম্পত্য সম্পর্ক

দীর্ঘসূত্রতা লাভ করে না, তা যে নষ্ট-দাম্পত্য সম্পর্কে পরিণত হয় তার নির্যাস তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'। তাঁর প্রদর্শিত পথেই বাংলা উপন্যাস রচনার জগতে এসেছিলেন 'সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' ও 'রমেশচন্দ্র দত্ত'। 'পালামৌ' উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে 'সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' ভ্রমণ সাহিত্যে নবদিগন্ত খুলে দিয়েছেন। এছাড়াও 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট', 'দামিনী' তাঁর অন্যতম রচনা। যদিও রচনাগুলিকে সার্থক উপন্যাস বলা হয় না। আবার 'রমেশচন্দ্রের' সামাজিক উপন্যাসে বিদ্যাসাগরের প্রবর্তিত বিধবাবিবাহ এবং অসবর্ণ বিবাহের প্রতি সরাসরি ঔপন্যাসিকের সমর্থনের কথা জানা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি জীবনকে 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' অনুধাবন করে সাহিত্যের মধ্যে চিত্রিত করার প্রয়াস করেছেন। মানুষের মনস্তত্ত্বের রহস্য, নারী-পুরুষের সম্পর্কের বিন্যাস, যৌন ভাবনার প্রকাশ ও ব্যক্তির সামাজিক মুক্তির প্রত্যাশা ঔপন্যাসিক তাঁর লেখায় প্রকাশ করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীসমাজের নারী কেন্দ্রিক মূল সমস্যা ছিল বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরোধ করা। বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ কেন্দ্রিক দাম্পত্য জীবন কেমন হয়, তাই তাঁর বেশীরভাগ উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। তাঁর সমসাময়িক কোনো ঔপন্যাসিক বাংলাসাহিত্য রচনায় তেমন ভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেননি। বটবৃক্ষের ছায়ায় যেমন কোনো গাছ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না, তেমনি তাঁর সময়কালে কোনো ঔপন্যাসিক তেমন ভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। সেকালের অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসের সংখ্যা যেমন কম ছিল, তেমনি বিষয় বৈচিত্রেও আধুনিকতার ছাপ তেমন ছিল না বলে মনে হয়। সেসময়ের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বিশেষ করে 'সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'(১৮৪৩-৮৯), 'তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়'(১৮৪৩-৯১), 'ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়'(১৮৪৭-১৯১৯),

‘শিবনাথ শাস্ত্রী’(১৮৪৭-১৯১৯), ‘রমেশচন্দ্র দত্ত’(১৮৪৮-১৯০৯), ‘ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়’(১৮৪৯-১৯১১), ‘যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু’(১৮৫৪-১৯০৫), ‘হরপ্রসাদ শাস্ত্রী’(১৮৫৩-১৯৩১) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

অন্যদিকে পুরুষ ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে মহিলা ঔপন্যাসিকদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যাঁরা নিজেদের রচনার গুণেই সাহিত্যের দরবারে অনন্যা। ‘আশাপূর্ণা দেবী’র পূর্ববর্তী মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে জনপ্রিয় ও প্রচারিত কয়েকজন ঔপন্যাসিকের নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, যাঁরা সাহিত্যের আকাশে আজও উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁদের মধ্যে ‘স্বর্ণকুমারী দেবীর’ নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়; তাঁর আবির্ভাবকাল ও সাহিত্য রচনাগুণে। পরবর্তীকালে যথাক্রমে ‘নিরুপমা দেবী’, ‘অনুরূপা দেবী’, ‘সীতা দেবী’, ‘শান্তা দেবী’, ‘আশালতা দেবী’, ‘জ্যোতির্ময়ী দেবী’, ‘অমলা দেবী’, ‘ইন্দিরা দেবী’, ‘শৈলবালা দেবী’, ‘গিরিবালা দেবী’ প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের নাম করা যায়। পুরুষ ঔপন্যাসিকদের পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকেও ‘স্বর্ণকুমারী দেবী’ বাংলাসাহিত্যের অঙ্গনে নারী হয়েও একটি গুরুত্বপূর্ণ আসন অধিকার করে নিয়েছেন তাঁর রচনাগুণের কারণে। উপন্যাস, গল্প, নাটক এবং কবিতা রচনায় তিনি ছিলেন যথেষ্ট পারদর্শী। তাঁর সম্পাদিত ‘ভারতী’ পত্রিকা সমকালে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলি হল, —‘দীপ নির্বাণ’ (১৮৭৬), ‘ছিন্ন মুকুল’ (১৮৭৯), ‘মালতী’ (১৮৮০), ‘মিবাররাজ’ (১৮৮৭), ‘হুগলীর ইমামবাড়ি’ (১৮৮৮), ‘স্নেহলতা’ (১৮৯০), ‘বিদ্রোহ’ (১৮৯০), ‘ফুলের মালা’ (১৮৯৫), ‘মিলন রাত্রি’ (১৮৯৫), ‘কাহাকে’ (১৮৯৮)। মূলত সামাজিক উপন্যাস রচনায় তিনি সাবলীল ছিলেন, তবে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনাতেও তিনি কৃতিত্বের দাবিদার। তাঁকে বাংলা সাহিত্যে যথার্থ অর্থে প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক হিসেবে অভিহিত করা হয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘দীপ নির্বাণ’ কম বয়সের রচনা, তাই

স্বাভাবিকভাবেই কাহিনীর অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কের সঙ্গে প্রণয় প্রসঙ্গের বর্ণনাতেও কাঁচা হাতের ছাপ লক্ষণীয়। পরবর্তীকালে দাম্পত্য ও প্রণয়সম্পর্ক সম্বন্ধে লেখিকার বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রকাশ লক্ষ করা যায় সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে। 'ছিন্ন মুকুল', 'স্নেহলতা', 'হুগলীর ইমামবাড়ি', 'কাহাকে' ইত্যাদি উপন্যাসে যেরকম বাস্তব অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর ঔপন্যাসিক রেখেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'স্নেহলতা' উপন্যাসে একটি বিধবা নারীর প্রেম ও বিবাহের মধ্য দিয়ে যে ঔচিত্য ঔপন্যাসিক সেই যুগে দেখিয়েছেন তা সেকালের বিরল ঘটনার সাক্ষ্যবাহী। অন্যদিকে 'কাহাকে' উপন্যাসটিকে তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলা হয়। কারণ লেখিকার সারাজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা লব্ধ অভিব্যক্তির স্পষ্ট প্রকাশ 'কাহাকে' উপন্যাসে লক্ষ করার মতো বিষয়। উপন্যাসের নায়িকা 'মণি' ওরফে 'মৃণালিনী' নিজের প্রেম ও বিয়ের উপাখ্যান বর্ণনা করেছে আত্মকথন ভঙ্গীতে। স্পষ্ট ও সাবলীলভাবে সেযুগের একজন নারীর আত্মকথন বিশেষত স্পর্ধার দাবি রাখে। নায়িকা 'মণি' যেমন তার বাল্য প্রেমের কথা বলেছে, তেমনি অকপটে বলেছে যৌবনের প্রেমের কথাও। একইসঙ্গে স্বীকার করেছে 'ব্যারিস্টার রমানাথ' ও বাল্যপ্রেমিক 'বিনয় কুমারের' সঙ্গে রোমাঞ্চকর প্রেমের প্রসঙ্গ। 'মণির' কথার ভঙ্গীতে লেখিকার নারীবাদী চেতনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। সে পুরুষ-বিদ্বেষী নয় কিন্তু পুরুষের মানসিকতার সাথে তার মানসিক বিরোধ। 'মণি' বিবাহ পরবর্তী প্রেমকে একমাত্র মনে করেনি, নিজের মনের কথা তথা প্রেমের কথা বলতে গিয়ে জড়তা বা সংশয়ে আক্রান্ত হয়নি। সে যেভাবে একাধিকবার বহু পুরুষকে ভালোবেসেছে সেকথা অকপটে স্বীকার করে নিয়েছে। প্রেম সম্পর্কে প্রথাগত ধারণাকে সে ভেঙে দিয়েছে, তেমনি ভাবে তাঁর দাম্পত্য জীবন সম্পর্কেও একই কথা বলা যেতে পারে। 'স্বর্ণকুমারী দেবী' নিজেই 'কাহাকে' উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ 'An unfinished song' করেছিলেন, স্বদেশ ও বিদেশে তাঁর অনুবাদ

বহুবার বহুভাবে প্রশংসিত হয়েছে। শুধু 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' কখনো তেমনভাবে তাঁর ন'দিদির লেখাকে গুরুত্ব দেননি অথবা প্রশংসা করেননি। 'ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী'কে লেখা একটি চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন—

"ন'দিদি আমাকে তাঁর 'ফুলের মালা'র তর্জমাটা পাঠিয়ে ছিলেন। এখানকার সাহিত্যের বাজার যদি দেখতেন, তাহলে বুঝতে পারতেন এসব জিনিস এখানে কেন কোন মতেই চলতে পারে না। এরা যাকে 'Reality' বলে সে জিনিসটা থাকা চাই"।[৩]

'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' যে যথার্থ বলেননি তার প্রমাণ বর্তমান পাঠক সঠিকভাবে 'কাহাকে' উপন্যাসটি পাঠ করলে হয়তো বুঝতে পারবেন। বর্তমানকালের অন্যতম উপন্যাস সমালোচক 'সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়' অথবা 'সুদক্ষিণা ঘোষ'-এর মতো সমালোচকরা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, ঔপন্যাসিক সত্তায় 'স্বর্ণকুমারী দেবী' সমকালীন অনেক লেখকদের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী ছিলেন। তাঁরা মনে করেন শুধু 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' নয় পরবর্তীকালের অন্যতম উপন্যাস সমালোচক 'শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়'ও তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' নামে সুপরিচিত গ্রন্থে পুরুষদের পক্ষপাতিত্ব করেছেন।

'স্বর্ণকুমারী দেবীর' পর নারী ঔপন্যাসিক হিসেবে 'অনুরূপা দেবী' এবং 'নিরুপমা দেবীর' নাম বিশেষ ভাবে স্মরণ করা যেতে পারে। এঁদের উপন্যাসে স্বাভাবিক ভাবে স্থান করে নিয়েছে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতি। 'নিরুপমা দেবী'র 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'দিদি' ও 'শ্যামলী' ইত্যাদি উপন্যাসে সমাজে প্রচলিত প্রথাগত সংস্কারগুলি বিশেষ করে লক্ষ করা যায়। দাম্পত্য সম্পর্কের ক্রম-পরিণতির মধ্য দিয়ে প্রতিটি উপন্যাসের সমাপ্তি সাধিত হয়েছে। পতিসেবা ও পারিবারিক আচার-বিচার পালন করতে গিয়ে নারী কতটা কাছে থাকে

পতিদেবতার, নাকি ক্রমশ তৈরি হতে থাকে মানসিক দূরত্ব। মনের ব্যবধান বাড়তে থাকে মনের মানুষের কাছ থেকে। সেসব কথাই উপন্যাসগুলিতে তুলে ধরেছেন 'নিরুপমা দেবী'। অন্যদিকে 'অনুরূপা দেবী'র উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে মনোমালিন্যের আভাসই বেশী করে চোখে পড়ে। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা তেত্রিশ। তাঁর উপন্যাসে সমকালীন নারী জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা আছে। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি বিধবার প্রেম, বিবাহ বিচ্ছেদ, নারীর পুনর্বিবাহ প্রভৃতির বিপক্ষে ছিলেন। তবু তাঁর রচিত উপন্যাস ভিন্ন মাত্রা বহন করে। মনীষী 'ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের' পৌত্রি হিসেবে তিনি ভারতের ঐতিহ্য ও আদর্শের প্রতি অনুগত থেকেও অনেক সার্থক উপন্যাস রচনা করেছেন। 'মন্ত্রশক্তি', 'মহানিশা', 'মা', 'গরিবের মেয়ে', 'পথহারা', 'ত্রিবেণী', 'চক্র', 'জ্যোতিহারা' ইত্যাদি উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের নানা আঙ্গিক চোখে পড়ার মতো। সমালোচকের মতে বলা যায়,

''স্বর্ণকুমারী দেবী'র মতো তেমন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ছিল না পরবর্তিনী অনুরূপা, নিরুপমা, গিরিবালা দেবীদের। নাগরিক মননের বৈদগ্ধও ছিল না তাঁদের। তাই মূলত গ্রামভিত্তিক ঘরোয়া সমাজ জীবনের কাহিনী রচনা করেছিলেন তাঁরা। সমাজের মূল্যবোধ যথেষ্ট দৃঢ়মূল ছিল তাঁদের মনে, মাতৃত্বে নারীর সার্থকতা একথা অবিশ্বাস করার কথা কল্পনাও করেননি তাঁরা, ভালো স্ত্রীরাও ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত উপেক্ষা, বিচ্ছেদ সয়েও সতী থেকেছে সামাজিক ঐতিহ্যের মাপেই। সমকালীন সমাজের ছবি আঁকতে গিয়ে নারী পুরুষের অবস্থাগত বৈষম্য তাঁদের চোখে ধরা পড়েছে। পণপ্রথায়, কন্যাদায়ে, পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহে, বৈধব্যের নিঃসঙ্গতায় নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজে নারীর যন্ত্রণাময় অবস্থিতি তাঁদের উপন্যাসে স্থান পেয়েছে''।[৪]

মন্তব্যটি যে যথার্থ সে সম্পর্কে দ্বিমত নেই। শুধু পর্যালোচনার খাতিরে 'অনুরূপা দেবী'র 'মা' উপন্যাসের একটু অংশ তুলে ধরা যেতে পারে। 'মা'

উপন্যাসে ‘মনোরমা’ একই সাথে একজন আদর্শ মা ও অন্যদিকে একজন আদর্শ পত্নী। তার স্বামী অরবিন্দ পিতৃআজ্ঞা পালন করে তাকে পরিত্যাগ করে। সে ‘রামায়নের’ সীতার মতোই পতিব্রতা, তাঁর বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য একমাত্র সন্তান অজিত। ঔপন্যাসিক ‘অনুরূপা দেবী’ ‘রামায়নের’ সীতা চরিত্রের প্রভাব ‘মনোরমা’ চরিত্রের উপর সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তিনি যুগের প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেননি। তাই হয়তো ‘মা’ উপন্যাসের নায়িকা ‘অরবিন্দে’র দ্বিতীয় স্ত্রী ‘ব্রজরানী’। সে যেমন দ্বিতীয় স্ত্রী তারউপর সন্তানহীনা, তাই স্বামীর ভালোবাসা ও মেয়েমহলের সন্মান কিছুই সে পায়নি। তাই জীবন্ত আগ্নেয়গিরির মতো সে ‘অরবিন্দে’র জীবন সন্দেহ ও বাক্যবানে জর্জরিত করে রেখেছিল। ‘মা’ উপন্যাসটি আসলে দুজন নারীর ভিন্ন ধরনের দুঃখের কাহিনী। ‘মনোরমা’ ভারতীয় নারীর সনাতন আদলে গড়া, ‘ব্রজরানী’ নিজের অধিকার সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন। আর তাই হয়তো ঔপন্যাসিক ‘ব্রজরানী’র সংলাপে বলেন–‘‘সতীনের উপর যারা মেয়ে দেয়, তাদের মতো মেয়ের শত্রু আর এ পৃথিবীতে কেউ নেই। ...সতীনের উপর মানুষ কেন মেয়ে দেয়? গঙ্গায় তো এখনও জলের অভাব হয়নি’’[৫]। এই বক্তব্য শুধু ‘অরবিন্দ’ ও ‘ব্রজরানী’র গুরুজনদের বিরুদ্ধে নয়, যে সমাজ পুরুষের একাধিক বিবাহের বিধান আছে, সেই সমাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। অন্যদিকে পিতৃসত্য পালনের জন্য সংসার ত্যাগী স্বামীর প্রতি কোন ক্ষোভ প্রকাশ করে না ‘মনোরমা’, সে অপেক্ষা করেন শুভদিনের আশায়, কিন্তু কখনোই তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না। পিতার প্রতি পুত্রের শ্রদ্ধা যেন অটুট থাকে, সেজন্য সে পুত্রকে বুঝিয়ে বলে—‘‘যদি তিনি নিয়ে যান, আপনিই যাবেন। যদি নিয়ে যাবার উপায় না থাকে, তবে অনর্থক ওঁর মনে আমরা কষ্ট দিতে যাব কেন?’’[৬] একটি দায়-দায়িত্বহীন দাম্পত্য সম্পর্কে এমন শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তেমনভাবে কোন ঔপন্যাসিক চিত্রিত করেননি। ‘শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়’ এর মতে—

"উপন্যাসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য অংশ অরবিন্দ ও ব্রজরাণীর দাম্পত্য সম্পর্কের বর্ণনা। অরবিন্দের ব্যবহারে নিখুঁত নিশ্ছিদ্র লৌকিক কর্তব্য পালনের সঙ্গে অবিচলিত উদাসীনতার সমন্বয় হইয়াছে। মনোরমার প্রতি বাক্যে ও ব্যবহারে সে কিছুমাত্র স্নেহ প্রকাশ করে নাই– যৌবনের সেই প্রথম প্রেমারাগরঞ্জিত অধ্যায় সে একেবারে জীবন হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে। অথচ তাহার ক্ষুদ্রতম কার্যে, তাহার ক্ষুদ্রতম ইঙ্গিতে ব্রজরাণী নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছে যে, তাহার সবটুকু প্রেম, সবটুকু উৎসাহ তাহার সপত্নী নিঃশেষে শুষিয়া লইয়াছে, প্রেমের পাত্রে তাহার জন্য এতটুকু উদ্বৃত্ত পড়িয়া নাই। সমস্ত লৌকিক কর্তব্যপালনের মধ্যে অরবিন্দের নিঃসঙ্গ অনাসক্ত মনের চিত্রটি খুব চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। জীবনের সহজ সমৃদ্ধি, প্রাণরসের নিগূঢ় সঞ্চরণ তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে, প্রতিজ্ঞা পালনের শুষ্কবৃন্তে সে কোনরূপে নিজেকে ধরিয়া রাখিয়াছে মাত্র। স্নেহ-প্রবৃত্তির এই নির্মম নিপীড়নে, এই কঠোর আত্মনিগ্রহে তাহার জীবনী-শক্তি তিল তিল করিয়া ক্ষয় হইতে চলিয়াছে। অবশেষে যে পক্ষাঘাত আসিয়া তাহাকে শয্যাশায়ী করিয়াছে তাহা এই জীবনব্যাপী আত্মনিরোধের চরম, অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মাত্র"।[৭]

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের জন্ম হয়েছিল নানাতর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। তারমধ্যে একটি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সমাজের অবহেলিত নারীদের নীতিশিক্ষা প্রদান করা। কিন্তু পুরুষের লেখার তুলনায় নারীর কলমে নারীর প্রতি শিক্ষা প্রদান স্বতন্ত্র মাত্রা নিয়ে দেখা দিল। পুরুষ ঔপন্যাসিকরা চেয়েছিলেন উপন্যাস পাঠিকা হিসেবে নারী সতীত্ব ধর্মে অবিচল থাকবে এবং সংসারের জন্য যাবতীয় কর্ম নিরলস ভাবে করবে। সেখানে নারীর মর্ম কথা ও মর্মান্তিক পীড়নের কথা তেমনভাবে স্থান পায়নি। পরবর্তীকালে নারীর হাতেই নারীর চরিত্র স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হতে থাকল। 'স্বর্ণকুমারী দেবী' 'অনুরূপা দেবী', 'সীতা

দেবী', 'শান্তা দেবী' প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের লেখাতেই বিবর্তনের ধারার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। অবশ্য আমরা এই কথাও স্বীকার করে নেই যে বাঙালী নারীরা যখন উপন্যাস লেখা শুরু করেন তখন পুরুষ সমালোচক ও লেখকরা সেই প্রচেষ্টাকে সুনজরে দেখেনি। যদিও অবহেলিত বাঙালী নারী সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো উপন্যাস রচনাতেও খুব বেশী দেরি করেননি। পুরুষদের উপন্যাস রচনা শুরু করার দু'দশকের মধ্যেই তাঁরা উপন্যাস রচনা শুরু করেন। 'স্বর্ণকুমারী দেবী' যে আড়ম্বরে নারী রচিত উপন্যাসের শুভ সূচনা করেছিলেন, তাকে পরিণতির দিকে নিয়ে গেছেন 'জ্যোতির্ময়ী দেবী' ও 'আশাপূর্ণা দেবী'র মতো ঔপন্যাসিকরা। যাঁদের লেখায় নানাভাবে নারীর অন্তঃমননের বহু-বিচিত্র কথন ফুটে উঠেছে। শুধু নারীর জীবন কথাই নয় পুরুষের জীবনের সঙ্গে তার ওতপ্রোত মিল খোঁজার চেষ্টাও করেছেন। পুরুষের জীবনকে তাঁদের নিজের মতো করে পরিলক্ষিত করে উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন। নারী ও পুরুষের অমোঘ দাম্পত্য সম্পর্ক প্রসঙ্গেও একইভাবে চিত্রিত করেছেন একের পর এক চিত্রপট। অবশ্য একথা একবাক্যে স্বীকার করতে হয় যে, নারী ঔপন্যাসিকদের লেখায় তুলনায় পুরুষ ঔপন্যাসিকদের থেকে অনেক বেশী বাস্তব আকারে নারীজীবনের সমস্যা চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু নারীকে সহজে কোনখানেই সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত পুরুষ জায়গা ছেড়ে দেয়নি। ঔপন্যাসিক হিসেবে 'অনুরূপা দেবী' যখন প্রতিষ্ঠার পথে, সেইসময় বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' লেখিকা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন। তিনি 'অনিলা দেবী' ছদ্মনামে 'অনুরূপা দেবী'র বিখ্যাত উপন্যাস 'পোষ্যপুত্র'(১৩১৭ বঙ্গাব্দ) সম্পর্কে লেখেন–

''ইহারও ভাষা যে অতি মধুর, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার মেয়ে বলিতেছিল, এত মধুর যে মুখ মারিয়া যায়, আর গিলিতে পারা যায় না। তা ভাষা যাহাই হোক, প্রায়ই উপমাগুলি যে না জানিয়া লেখা, তাহা পড়িলেই চোখে ঠেকে। আর একটা জিনিস তার চেয়েও বেশী ঠেকে–সেটা

অসহ্য জ্যাঠামো''।[৮]

'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ে'র মতো সমালোচকদের ক্ষেত্রে আলোচ্য মন্তব্য প্রণিধান যোগ্য কারণ তিনি একজন স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক। কিন্তু সমালোচনা করার সময় তিনি হয়তো ভুলে গেছেন যে একজন নারী ঔপন্যাসিকের উপন্যাস সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন। আমরা জানি প্রতিটি উপন্যাসে প্রধানত ঔপন্যাসিকের অন্তরাত্মার প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়। তাই যে কোন উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনায় পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে সাধারণ ধারণা থাকা দরকার :–

১. ঔপন্যাসিক কোন পদ্ধতিতে তাঁর সমকালীন জগত ও সমাজ জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন।

২. তিনি সামাজিক রীতি-নীতির কী কী বিষয় গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন।

৩. তিনি সমাজের কী কী বিষয় পরিহার করেছেন।

৪. তিনি মানুষের জীবনের কোন ধরনের সমস্যা উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন।

৫. তিনি জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে, কোন ধরনের নৈতিক মূল্য নিষ্কাশিত করেছেন।

'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ে'র ক্ষেত্রে হয়তো এইসমস্ত দিকে লক্ষ্য দেওয়া সেসময়ে সম্ভব ছিল না বলেই মনে করা যেতে পারে। তাই হয়তো 'অনুরূপা দেবী'র লেখা সম্পর্কে তিনি একাধিকবার বিরূপ মন্তব্য করেছেন। অবশ্য সুখের বিষয় এই যে, পরবর্তীকালে 'আশাপূর্ণা দেবী' স্বতস্ফূর্তভাবে 'অনুরূপা দেবী'র প্রশংসা করেছেন। 'কথাসাহিত্য পত্রিকা' 'অনুরূপা দেবী বিশেষ সংখ্যা' প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করলে 'আশাপূর্ণা দেবী' সেখানে লিখেছেন–

''সত্যি ভারী খুশি হয়েছি আপনাদের এই সংখ্যাটি প্রকাশের খবর শুনে।

বাংলাদেশে মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে অনুরূপা দেবীর স্থান আজও সর্বোচ্চ শিখরে একথা অবিসম্বাদী সত্য। বার্ধক্য এবং অস্বাস্থ্যে তিনি আজ তাঁর কলম গুটিয়েছেন। কিন্তু তাঁর খোলা কলম বাংলা সাহিত্যে যে প্রচুর সম্পদ দান করে গেছে, তার ঋণ সহজে শোধ হবার নয়। আমরা যদি সে ঋণ যথার্থ ভাবে স্বীকার করতে পারি, তো সে অনুরূপা দেবীর সম্মানবৃদ্ধি নয়, আমাদেরই সম্মানরক্ষা''।[৯]

আলোচ্য উদ্ধৃতির ভিত্তিতে আমরা মোটামুটি ভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, 'অনুরূপা দেবী'র উপন্যাস সম্পর্কে প্রশংসা করতে না পারলেও ব্যঙ্গোক্তি করে তাঁর সৃষ্টির অবমাননা করা উচিত নয়। তাতে করে নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করার মতো অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়।

প্রকৃতরূপে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় 'অনুরূপা দেবী' বেশী আগ্রহী ছিলেন। তুলনায় তাঁর সামাজিক উপন্যাসগুলি কাহিনীর গভীরতা স্বাভাবিকভাবে কিছুটা লঘু বলা যেতে পারে। মূলত উপন্যাসের চরিত্রের প্রতি সজাগ সহানুভুতি প্রকাশ করেছেন লেখিকা। তিনি মানব জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্ব দাম্পত্য জীবনের উপর তেমন ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেননি। তবে উপন্যাসের বিষয়ের গভীরতায় দাম্পত্য প্রসঙ্গ এসেছে স্বাভাবিক নিয়মে। 'বাগদত্তা' উপন্যাসে দৈবের প্রভাব থাকলেও শচিকান্ত ও কমলার জীবন প্রবাহের নানা মোড় সুস্পষ্টভাবে ঔপন্যাসিক চিত্রিত করেছেন। মূলত বিবাহ পরবর্তী প্রেমই উপন্যাসটির মূল উপজীব্য। শচিকান্ত ও কমলার বিবাহপরবর্তী জীবনচিত্র লেখিকা গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য উপন্যাসগুলিতেও একইভাবে মানব জীবনের নানা মোড় সুস্পষ্ট ভাবে ঔপন্যাসিক চিত্রিত করেছেন। 'উত্তরায়ণ' উপন্যাসে 'সলিল' ও 'আরতির' প্রেমের পথে কিভাবে একের পর এক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে, এবং তা থেকে কিভাবে পরিত্রাণ

পাওয়া সম্ভব হয়েছে, লেখিকা তাই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উপন্যাসের অগ্রগতিতে দেখা যায় 'সলিল' তার প্রণয় পাত্রীকে ত্যাগ করে মায়ের ইচ্ছায় অন্য একজন কন্যাকে বিবাহ করে। যার পরিণতি হয় ভয়ঙ্কর। ইচ্ছাকৃতভাবে একটা নষ্ট-দাম্পত্য সম্পর্ক তৈরি করে 'সলিল' নিজেই একসময় অবসাদের মধ্যে পড়ে যায়। সে মুক্তির পথ খুঁজে পায় পূর্বের পরিত্যক্তা প্রণয়ীর প্রণয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে। লেখিকা একদিকে যেমন সুস্থ স্বাভাবিক দাম্পত্য সম্পর্কের ছবি তুলে ধরেছেন অন্যদিকে তেমনি নষ্ট-দাম্পত্য বা বিরোধের ছবিও চিত্রিত করেছেন।

আমরা পর্যালোচনার মাধ্যমে অনুধাবন করতে পারি যে, 'অনুরূপা দেবী' মূলত চারটি উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর নিজস্ব প্রতিভার নির্যাসকে অনেকটাই তুলে ধরতে পেরেছেন বলে মনে হয়। উপন্যাস চতুষ্টয় হল:– 'গরীবের মেয়ে', 'মন্ত্রশক্তি', 'মহানিশা' ও 'পথহারা'। 'মন্ত্রশক্তি' উপন্যাসে পৌরাণিক চরিত্র 'বেহুলার' মতো একজন নারীচরিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। 'বাণী' নামে একজন নারী তার স্বামীকে 'বেহুলার' মতো পুনর্জীবন দানে সমর্থ হয়। মূলত ভক্তি শ্রদ্ধা ও পুরাণের দেবত্ব আরোপের মধ্য দিয়ে আলোচ্য উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের ভিত তৈরি করেছে। লেখিকার অন্যান্য উপন্যাসগুলিতেও একইভাবে সমগুণে দাম্পত্য সম্পর্কের বর্ণনা পাওয়া যায়। বিশিষ্ট সমালোচক 'শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়' তাই হয়তো 'অনুরূপা দেবী'র উপন্যাস সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন–

''উপন্যাস ক্ষেত্রে বিশেষত মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অনুরূপা দেবীর স্থান সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার কয়েকখানি উপন্যাস সাহিত্য চিরস্মরণীয়তা লাভের উপযুক্ত। তাঁহার রচনার মধ্যে নারী হস্তের স্পর্শ নির্ভুল ভাবে নির্দেশ করা কঠিন–সাধারণত তাঁহার মন্তব্যের প্রাচুর্য ও বিশ্লেষণের

গুরুত্ব পুরুষের পাণ্ডিত্য, পুরুষ আলোচনার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। তথাপি তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে কতকগুলি দৃশ্য রচয়িত্রীর নারী সুলভ কামনীয়তার নিদর্শন। 'মা' উপন্যাসে ব্রজরাণীর নিদারুণ অভিমান ও ঈর্ষা; গরীবের মেয়ে'তে নীলিমার বঞ্চিত হৃদয়ের প্রেম বুভুক্ষা; মন্ত্রশক্তি'তে বানীর নিগূঢ় মর্মোৎঘাটন; পথ-হারা'তে উৎপলার অতর্কিত নারীত্ব বিকাশ এই সমস্ত দৃশ্যকে নারীর স্বজাতি সম্বন্ধে সুক্ষ্মদর্শিতা ও সহজ ও সংস্কারলব্ধ অভিজ্ঞতার প্রমাণ স্বরূপ দাখিল করা যাইতে পারে''।(১০)

'অনুরূপা দেবী'র রচিত উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচকের উক্তিটি যথার্থ, এ বিষয়ে সংশয় নেই। সেইসঙ্গে উক্ত উক্তিটি পূর্বে আলোচিত দাম্পত্য সম্পর্ক বিষয়ক বিশ্লেষণের সমর্থন জোগায়।

'অনুরূপা দেবী'র সঙ্গে প্রায় একবাক্যে আর একজন ঔপন্যাসিকের নাম উচ্চারণ করা হয়, তিনি হলেন 'নিরুপমা দেবী'। তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস 'উচ্ছৃঙ্খল', তেমনভাবে ঘটনার ঘনঘটায় জমে উঠতে পারেনি বলে সমালোচকরা মন্তব্য করেন। অনেক সমালোচক মনে করেন তাঁর প্রথম লেখায় অপরিণত মননের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। অবশ্য পরবর্তীকালে লেখা 'অন্নপূর্ণার মন্দির' উপন্যাসে লেখিকা স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করেন তাঁর প্রকৃত ঔপন্যাসিক সত্তা নিয়ে। উপন্যাসটির মধ্যে একটি গরীব পরিবারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। 'সতী' নামের একজন নারীর জীবনের ওঠা নামার বিভিন্ন ঘটনাকে লেখিকা বর্ণনা করেছেন। মূলত চরিত্রটির দৃপ্ত তেজস্বীতা, নীরব সহিষ্ণুতা ও অনমনীয় আত্মসম্মান জ্ঞানের একটা তীব্র জ্বালাময় ভঙ্গীমা প্রকাশ করাই ছিল লেখিকার মূল উদ্দেশ্য। মুখ্যচরিত্রের ও গৌণচরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখিকা প্রেম, বিবাহ ও দাম্পত্যজীবন বিজ্ঞাপিত করতে চেয়েছেন। উপন্যাসে 'সতী' মুখ্যচরিত্র হলেও তুলনায় গৌণচরিত্র 'সাবিত্রী' অনেকটাই প্রাঞ্জল। তার

বিবাহের প্রসঙ্গে প্রেমের সার্থকতা তেমনভাবে নেই কিন্তু প্রেমের প্রকাশের অবকাশ আছে। 'সাবিত্রী' একসময় দাম্পত্যসম্পর্কে আবিষ্ট হয়ে পড়লেও 'সতী'র আত্ম-বিসর্জন যেন কালো ছায়া ডেকে আনে তার জীবনে। এক নারীর প্রভাবে আর এক নারীর দাম্পত্য জীবনে কিভাবে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় 'নিরুপমা দেবী' তা 'অন্নপূর্ণার মন্দির' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

"নিরুপমা দেবীর উপন্যাস ও ছোটগল্প সংখ্যায় অল্প, তাহাদের মধ্যে বিষয় বৈচিত্রেরও অভাব আছে, কিন্তু সব কয়টিই কলাকৌশলে বিশেষ সমৃদ্ধ। প্রেমের বিরোধ ও দাম্পত্যজীবনের সংঘর্ষ প্রায় সমস্ত উপন্যাসের বিষয়, এবং ইহা লেখিকার বিশেষ কৃতিত্বের নিদর্শন যে, এই সংঘর্ষের উপাদান আমাদের সাধারণ, বৈচিত্র্যহীন গার্হস্থ জীবন হইতেই আহড়িত হইয়াছে"।[১১] অন্যদিকে 'দিদি' উপন্যাসটিতে পুরুষের একাধিক বিবাহের ফলে কিরূপ দাম্পত্য-সমস্যার সৃষ্টি হয়, তার বিবরণ আছে। উপন্যাসটি ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটিতে 'অমর', 'সুরমা' ও 'চারু' নামে তিনজনের জীবনের আবর্তে দাম্পত্য সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাত প্রতিরূপায়িত হয়েছে। 'অমর' প্রথম পত্নী 'সুরমা'কে অবজ্ঞা করে 'চারু'র প্রণয়ে আবদ্ধ হয়ে বিয়ে করে। 'সুরমা' প্রতিবাদ না করে নিজের অদৃষ্ট বলে মেনে নেয়, এবং নিজেকে সবকিছু থেকে দূরে রেখে নিঃস্বার্থভাবে 'অমরে'র সংসারের জন্য উৎসর্গ করে দেয়। সেবা-শুশ্রূষায় কারো প্রতি তার কোনরকম কার্পণ্য নেই। কিন্তু তার বিনিময়ে কোনদিন কারো কাছ থেকে পায়নি নুনতম সৌজন্যতা। একসময় 'অমর' নিজেই ভুল বুঝতে পারে, এবং 'সুরমা'কে আবার প্রণয় বন্ধনে জড়াতে চায়। কিন্তু ততদিনে 'সুরমা' তার সতিনকে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে স্নেহশীলা দিদি হয়ে নির্বাসন গ্রহণ করেছে। এবং নিজে মনে-প্রাণে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা করেছে যে স্বামীর সঙ্গে কোন রকম সংকোচ না দেখিয়ে তাদের পূর্বসম্পর্কের

কোন স্মৃতিকে আর জাগিয়ে রাখবে না। কিন্তু ততদিনে অমরের মনে পরিবর্তন ঘটেছে। সে 'সুরমা'কে পূর্বের ন্যায় কাছে পেতে চায়। কিন্তু ততদিনে জীবনতরী বহুদূরে চলে গেছে। তবু 'অমর' হাল না ছেড়ে অপেক্ষা করে। উপন্যাসের শেষপর্যায়ে দেখা যায় বয়স সায়াহ্নে তিনজনই ভুল বুঝতে পারে। অনুতপ্ত হয়ে পুনরায় পূর্ব-দাম্পত্য সম্পর্ককে নতুন করে তৈরি করার মাধ্যমে জীবনযাপন করে। দাম্পত্য সম্পর্কের এমন মোড় সেযুগের অন্য কোন উপন্যাসে তেমনভাবে চোখে পড়ে না।

'আশাপূর্ণা দেবী'র পূর্ববর্তী নারী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে 'শান্তা দেবী' ও 'সীতা দেবী'র নাম বেশীরভাগ ক্ষেত্রে একসঙ্গে উচ্চারিত হয়। দুজন ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে চরিত্র ও কাহিনীর মিল বহুক্ষেত্রে খুঁজে পাওয়া যায়। তাছাড়া তাঁরা দুইবোন পিতা 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের' স্নেহ ও প্রশ্রয়ে সেযুগেও পড়াশুনা ও স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। তাঁদের পিতা 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পিতার সহচর্যে ও পরিচর্যায় সমবয়সী দুইবোন মিলিত প্রয়াসে বাংলা উপন্যাস জগতে সেদিনের পটভূমিকায় নব অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন। প্রথম জনের জন্ম ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে আর 'সীতা দেবীর' জন্ম ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে। 'স্বর্ণকুমারী দেবী'র মতো তাঁরাও আশৈশব সাহিত্য ও সংস্কৃতির আবহাওয়াতেই বড় হয়ে উঠেছিলেন। শৈশব অবস্থা থেকে দুইবোনেরই প্রচুর পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সাহিত্যের পাঠভ্যাস ছিল। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে দুইবোন যৌথ প্রয়াসে 'Folk Tales of Hindusthan' বইটি অনুবাদ করে 'হিন্দুস্থানী উপকথা' নামে প্রকাশ করেন। এরপর আবার যুগ্ম প্রয়াসে 'সংযুক্তা দেবী' নামে একটি উপন্যাস রচনা করেন। উপন্যাসটির নাম 'উদ্যানলতা', প্রকাশিত হয় ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে। উপন্যাসটি সম্পর্কে পরবর্তীকালে 'শান্তা দেবী' লিখেছেন:—

''সীতা আর আমি তখন সংযুক্তা দেবী নাম নিয়ে

প্রবাসী'তে উদ্যানলতা উপন্যাস লিখেছিলাম। ছাত্রছাত্রী-মহলে উপন্যাসটির বেশ নাম হয়েছিল। ...সংযুক্তা দেবীকে আবিষ্কার করবার জন্য তখনকার অনেক খ্যাতনামা লেখক-লেখিকা নানা সন্ধান করেন। একবার বোধহয় মাঘোৎসবের সময় শারীরিক অসুস্থতার জন্য সুবিখ্যাত লেখিকা নিরুপমা দেবী একটু বিশ্রামের জন্য আমাদের বাড়ি এসে হাজির। আমরা সংযুক্তারা যে বয়স্কা মহিলা নই দেখে তিনি বিস্মিত ও পুলকিত হলেন''।(১২)

যদিও উক্ত মন্তব্যটি 'সংযুক্তা দেবী'দের ব্যক্তিসত্তা নিয়ে লেখা, তবু যেন মনে করা যেতে পারে যে প্রচ্ছন্ন ভাবে উপন্যাসটির শ্রেয়র কথাই বেশী করে বলা হয়েছে। আর একটি বিষয় উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে 'উদ্যানলতা' উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের তেমন কোন বিশেষ চিত্ররূপ পাওয়া যায় না বলেই মনে হয়। উপন্যাসটিতে বিশেষত আছে নারী-শিক্ষার কথা আর নারীর ব্যক্তিসত্তার শিকড়ের সন্ধানের প্রসঙ্গ। 'বেথুন স্কুলের' সিংহদুয়ার দিয়ে বেরিয়ে আসা শিক্ষিত মেয়েদের পূর্বসূরিদের কথাই উপন্যাসটির উপজীব্য বিষয় হিসেবে পর্যবসিত হয়েছে বলে মনে হয়। যাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলতে গিয়ে নারী একদিন খুঁজে পায় তাঁদের প্রকৃত জীবনের মানে। শুধুমাত্র পুরুষের অধীনস্থ হয়ে না থেকে, একসময় প্রকৃত অর্ধাঙ্গিনী হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতভাবে নারী নিজেই শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে সমাজের সর্ব ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর মুহূর্ত থেকে। 'শান্তা দেবী' ও 'সীতা দেবী'র রচনায় এরকমই বহু নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যতা অঙ্কিত হয়েছে বিচিত্র আঙ্গিকে।

'শান্তা দেবী' রচিত 'জীবন দোলা' উপন্যাসটি আলোচ্য গবেষণা প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। একজন নারীর গোটা জীবনের উত্থান-পতনের কাহিনী উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

উপন্যাসটিতে ‘গৌরী’ নামের একজন নারীর জীবনের বিচিত্র সমস্যা ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। উপন্যাসটিতে ‘গৌরী’ কেন্দ্রীয় চরিত্র, আর তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে অন্যান্য চরিত্রগুলি। তার দাম্পত্য জীবনের শুরুর মুহূর্তে দু’জন প্রেমিক ‘সঞ্জয়’ আর ‘অপূর্ব’ একইসঙ্গে উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত ভাবে কাহিনীতে প্রবেশ করে। পরবর্তীকালে ‘গৌরী’র বিবাহের পরেই উক্ত প্রেমিক-দ্বয়ের জীবননাট্যের যবনিকাপাত ঘটেছে। তার কাছে প্রেম এবং বিবাহ দুটি বিষয়ই আলাদা আলাদা মাত্রা বহন করে। তার জীবনে প্রেম প্রেরণার জন্ম দিয়েছে আর বিবাহ দিয়েছে জগতের জন্য কর্মোদ্দমের উদ্যোগ। ‘সীতা দেবী’ রচিত ‘রজনীগন্ধা’ উপন্যাসটিও এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ‘ক্ষণিকা’, ‘মেনকা’ ও ‘লালু’ নামে তিনজন ভাই-বোনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উপন্যাসটির মূল বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে। ‘ক্ষণিকা’ তার দরিদ্র পরিবারের হাল ধরতে গিয়ে চাকরির সন্ধান করতে থাকে। আর সেই পর্বেই প্রথম দেখা হয় ‘অনাদিনাথে’র সঙ্গে। ‘অনাদিনাথে’র সঙ্গে ক্ষণিকার প্রেম পর্বের বিস্তৃত বিবরণ উপন্যাসে রোমান্সের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ‘অনাদিনাথ’ ঘটনাক্রমে ‘মনোজা’ নামে একজন মেয়েকে বিবাহ করে, এতে করে ক্ষুব্ধ হয়ে ‘ক্ষণিকা’ তাকে বহুভাবে তিরস্কার করে। কিন্তু কোন মতেই সে আর ‘মনোজার’ সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে পারে না। নিয়তির অমোঘ নির্দেশে ‘মনোজা’ পরলোক গমন করলে, পরবর্তী সময়ে ‘ক্ষণিকা’ তার বিক্ষুব্ধ-প্রণয় ‘অনাদিনাথ’কে অর্পণ করে নিজের মনের কামনা চরিতার্থ করে। এই উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচকদের মত অনুসারে বলা যায় যে একজন নারীর এমন তীব্রতর প্রেমের অপ্রতিরোধনীয় মনোভাব বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে বিরল। ‘শান্তা দেবী’ ও ‘সীতা দেবী’ দুজনে বহুদিন ধরে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের জগতে একত্রে উচ্চারিত দুটি নাম। তাঁদের উপন্যাসের মধ্যে মূলত নারী জীবনের টানাপোড়েন বেশী করে চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু তাতে করেও দাম্পত্য

সম্পর্কের ভিন্নতা বহুভাবে চিত্রিত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। কখনো তার প্রকাশ ঘটেছে প্রণয় প্রার্থীকে নিয়ে, আবার কখনো অপরিচিত আবাল-বৃদ্ধ কোন কুলীনকে দিয়ে। আসলে তুলনামূলক বিচারে দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্র অঙ্কনে ঔপন্যাসিক দুইবোনই একে অপরের দোসর বলে আমরা সহজেই মনে করতে পারি।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উপন্যাস রচনায় যে ঔপন্যাসিকরা উনিশ-শতকের উত্তরাধিকার বহন করেও বিশ-শতকের রাজপথে হেঁটেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন 'বেগমরোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন'। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে এক অভিজাত মুসলমান পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর লেখা একটি মাত্র উপন্যাস 'পদ্মরাগ' ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের নিবেদন অংশে তিনি জানিয়েছেন, উপন্যাসটি প্রকাশের প্রায় ২২ বছর আগে থেকে উপন্যাসটি লেখা শুরু করেছিলেন। সেই দিক থেকে দেখলে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে'র লেখা 'চোখের বালি' উপন্যাসটি প্রকাশের এক বছর আগে 'পদ্মরাগ' রচনা করা শুরু হয়েছিল। উপন্যাসটিতে একজন নারী মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে অন্যান্য সমস্ত চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। 'সিদ্দিকা' নামে সেই নারী চরিত্র সেদিনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম প্রতিবাদী প্রতিমা। 'সিদ্দিকা' একসময় উপলব্ধি করে পুরুষতন্ত্র থেকে সমাজকে কোনমতে আর নিষ্কলুষ করা সম্ভব হবে না। এমন কি বিবাহিত স্বামীও সেই প্রথাগত পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি, তখন প্রতিবাদী 'সিদ্দিকা' নিজের দাম্পত্য সম্পর্কের ইতি টেনে দিয়ে, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমাজ সংস্কারের জন্য জীবন উৎসর্গ করে দেয়। তার পূর্বজ 'দীনতারিনী দেবী'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজের সমস্ত সম্পত্তি সমাজ কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে। 'দীনতারিনী'র দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সাবধান করে দিয়ে 'সিদ্দিকা'কে বলেন –''তুমি যে সমাজের সমূহ কল্যাণের নিমিত্ত দাম্পত্য

জীবনের জলাঞ্জলি দিলে, ইহাতেই আমার অধিক দুঃখ হইতেছে। কৃতঘ্ন সমাজ তোমার এ অমূল্য দানের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিবে না। সমাজ সেবা করিতে গেলে আজীবন অভিসম্পাত কুড়াইতে হইবে। এখনও সময় আছে ঘরে ফিরিয়া যাও পদ্মরাগ''।[১৩] কিন্তু কোন আবদার 'পদ্মরাগ'কে আর ঘরমুখো করতে পারেনি। যে দাম্পত্যজীবন সে একবার ত্যাগ করে এসেছে তার দিকে কোনদিন ফিরে তাঁকায়নি পরবর্তী জীবনে। উপন্যাসটিতে অসম অসুখী-দাম্পত্য জীবনের কথা আছে, তবে তার প্রেক্ষিত বৃহৎ সমাজে প্রতিষ্ঠিত রূপে ঔপন্যাসিক প্রকাশ করেছেন। তাই আলোচ্য পর্বে উপন্যাসটির কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করে যথাযথ বিশ্লেষণ হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে।

'জ্যোতির্ময়ী দেবী' সর্বমোট পাঁচটি উপন্যাস রচনা করেছেন। 'ছায়াপথ'(১৩৪১), 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ'(১৩৫৫), 'মনের অগোচরে'(১৩৫৯), 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'(১৩৭৪), 'হরিজন উন্নয়ণ কথা'(১৩৯০)। ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি বিশেষত ইতিহাসকে তাঁর উপন্যাস প্রাধান্য দিয়েছেন। অবশ্য সেইসঙ্গে উপন্যাসের চেনা উপাদানগুলিকেও তিনি গ্রহণ করেছেন। তাঁর উপন্যাসে প্রেম-বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনের কথা যথাযথ ভাবে আছে বলে ধরে নেওয়া যায় খুব স্বাভাবিকভাবে। প্রথম উপন্যাস 'ছায়াপথ'-এর নায়িকা 'সুপ্রিয়া' যেমন উপার্জনশীল তেমনি ব্যক্তিত্বময়ী। স্বাভাবিক ভাবে সে প্রতিবাদ করে পণপ্রথা ও কৌলিণ্যপ্রথার মতো নানাবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। কিন্তু হাজারও প্রতিবাদের পরেও যখন দাদার বন্ধু 'বিভাস'কে বিবাহ করে, তারপরেও নিজের মতে অটল থেকেছে 'সুপ্রিয়া'। দূরে প্রবাসে শিক্ষকতার চাকরি করার জন্য দাম্পত্যজীবনে নানারকম সমস্যা দেখা দেয়। 'বিভাস' চায় এই নৈকট্যহীন দাম্পত্যের অবসান ঘটুক, তাই সে 'সুপ্রিয়া'কে চাকরিতে জবাব দেওয়ার কথা বার বার বলে। কিন্তু 'সুপ্রিয়া' তা

কোন মতেই মেনে নেয় না, শেষ পর্যন্ত নিজের শিক্ষার শক্তি প্রমাণ করে দিয়ে পায়ের তলার মাটি দৃঢ়তার সঙ্গে চিনিয়ে দেয়। এখানেই নব দাম্পত্য সম্পর্কের উন্মোচন ও প্রাধান্য দান করেছেন ঔপন্যাসিক। যা আজকের যুগের প্রায় বেশীরভাগ নারীর পরিচয় রূপে স্বীকৃত পেয়ে থাকে। নারীর যোগ্য সম্মানে চাকরি করার জন্য দাম্পত্য সম্পর্কের তিক্ততা বহুক্ষেত্রে কেটে গেছে। আসলে নারী যে সংসার সুখের একমাত্র কাণ্ডারী, তা সেদিনের যুগে যেমন সত্য ছিল আজকের যুগেও তেমনি সত্য। আলোচ্য উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচক 'শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়' লিখেছেন–

"উপন্যাসের আসল সমস্যা হইল সুপ্রিয়ার বিবাহ বিমুখ চিত্তে ধীরে ধীরে প্রণয়ের মোহ সঞ্চার– বিভাসের প্রতি সুপ্রিয়ার নিগূঢ় অভিমানে কোনো উদ্ধত বিদ্রোহ, জ্বালাময় চিত্তদাহ বা উচ্চকণ্ঠ স্বতন্ত্র-ঘোষণা নাই, আছে একদিকে দৃঢ় সংকল্প ও কুন্ঠিত অনাগ্রহ, অন্যদিকে নারীর অর্ধজড়, পুরুষের তীক্ষ্ণ প্রভাবে অভিভূত, রাহুগ্রস্ত জীবনের স্বাধীন স্ফুরণের সাধনা। তাহার ধূসর মনে প্রেমের শান্ত রশ্মিচ্ছটার বিকিরণ, ও ইহার অপরূপত্বের আবিষ্কার সুন্দরভাবে ও সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। এই উপন্যাসের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত সমস্যার অবসান হয় নাই– সুপ্রিয়ার স্বাতন্ত্রবাদ বিবাহোত্তর জীবনেও সংক্রামিত হইয়া দাম্পত্যজীবনে একটা বিপরীতগামী আবর্তের সৃষ্টি করিয়াছে"।[১৪]

'জ্যোতির্ময়ী দেবী'র অন্যান্য উপন্যাসগুলিতে দাম্পত্য সম্পর্কের তুলনায় ইতিহাস প্রসঙ্গ বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন 'হরিজন উন্নয়ন কথা' উপন্যাসে 'গান্ধীজী'র নেতৃত্বে 'ভারতবর্ষের' স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের কথা বেশী করে বর্ণনা করা হয়েছে। 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসেও একই রকম ভাবে 'ভারতবর্ষের' স্বাধীনতার প্রসঙ্গ আছে। সার্বিক দিক থেকে 'জ্যোতির্ময়ী দেবী' উপন্যাসের জগতে রাজনৈতিক আন্দোলনের চিত্রপট তৈরি করেও নারী

জীবনের নানা প্রসঙ্গ তার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। ঔপন্যাসিক হিসেবে এখানেই তাঁর ব্যতিক্রমী সার্থকতা।

'স্বর্ণকুমারী দেবী' থেকে 'আশাপূর্ণা দেবী' পর্যন্ত নারী ঔপন্যাসিকদের রচনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে 'ড. ছন্দা রায়' জানিয়েছেন–

''পুরুষতন্ত্রের দৌরাত্মের বিরুদ্ধে নারীর কলম সরব হতে শুরু করেছিল উনিশ শতকের শেষ পর্ব থেকেই। কিন্তু নারীদের কলমের উপন্যাসে ছিল সমান্তরাল দুটি ধারা। একটি ধারার নারীর স্বর তখনও আনুগত্য কাটিয়ে উঠতে পারেনি। পুরুষের অভিভাবকীয় আশ্রয়কে অত্যাজ্য ভেবে জীবন যন্ত্রনার কারণ করে তোলা হচ্ছে নিয়তি অথবা কর্মফলকে। দ্বিতীয় ধারা স্বর প্রতিবাদের। এই ধারাতে 'আশাপূর্ণা দেবী' আলাদা করে চোখে পড়েন। আমাদের বিস্মিত করে তাঁর পরিকল্পনার ব্যাপ্তি। হ্যাঁ, ঘরেই কথাই বলেন তিনি, কিন্তু স্থান-কাল-পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নয়। নারী-পুরুষের সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করতে গিয়ে দেড়শো বছরেরও বেশি কাল-পরিক্রমায় প্রাক-উপনিবেশ পর্ব থেকে তিনি পৌঁছে যান উপনিবেশোত্তর পর্বে। তবে ঘটনাবহুল পট উপন্যাস তিনটিকে ধারণ করে রাখলেও ইতিহাসের কণ্ঠস্বর কোথাও মুখর হয়ে ওঠে না। বহির্জীবনের ভাঙাগড়ার চিহ্নগুলো মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে চোরা লণ্ঠনের আলোয়। সময়ের আসল মর্জিটা আশাপূর্ণা ধরেন সমাজের রীতি-নীতিতে, মানুষের চলনে-বলনে। তাই দিয়েই সেযুগ–এযুগের বিচার''।[১৫]

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উপন্যাস রচনার প্রেক্ষিতে দেখা যায় 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ে'র পরবর্তীকালে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' যোগ্য কাণ্ডারীর মতো হাল ধরেছেন। তাঁর লেখা উপন্যাসে বৈচিত্র্যতার জন্য একদিকে যেমন পুরানো ঐতিহ্য ধরা পড়ে তেমনি নতুন ভাব ও ভাবনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

তাঁর উপন্যাস নর-নারীর জীবনকে বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করার স্বাক্ষর বহন করে। ঔপন্যাসিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার আগে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' অনেকটা সময় পেয়েছেন নিজেকে সঠিকভাবে তৈরি করে নেওয়ার। তাঁর পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের রচনা ও বিশ্বসাহিত্যের নানাতর ভাব-ভাবনা পর্যবেক্ষণ করে ঔপন্যাসিক হিসেবে নিজস্ব সত্তা প্রকাশ করার অবকাশ পেয়েছিলেন। আর তার সূত্র ধরে তিনি লিখেছেন 'বৌঠাকুরাণীর হাট', 'চোখের বালি', 'চতুরঙ্গ', 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা' ইত্যাদি বিখ্যাত উপন্যাস। যে পরিমানে তাঁর সৃষ্টি সম্ভার তাতে করে কোন ভাবেই সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে একত্রে কোন বিশেষ পর্যায়ে পর্যালোচনা করা তেমনভাবে সম্ভব হবে না। তবু সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে দাম্পত্য সম্পর্ক কতটা ও কিভাবে তাঁর উপন্যাসে চিত্রায়িত আছে তারই অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা যেতে পারে আলোচ্য অংশে।

'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে'র লেখা প্রথম আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপন্যাস হল 'চোখের বালি'(১৯০৩)। এই উপন্যাস লেখার বহুপূর্বে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট' প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সেই উপন্যাসে 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের' প্রভাব লক্ষ করা যায় বলে মনে করা হয়ে থাকে। আর 'বঙ্কিমচন্দ্রের' উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের রূপরেখা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। তাই প্রথম দিকের 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষী' উপন্যাস দুটিকে বাদ দিয়ে 'চোখের বালি' উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্ররূপ নির্যাস রূপে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। 'চোখের বালি' উপন্যাসে 'মহেন্দ্র' ও 'আশার' দাম্পত্য সম্পর্কের সূত্রপাত ও পরিণত অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ ঔপন্যাসিক ছত্রে ছত্রে বর্ণনা করেছেন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে। উপন্যাসের একেবারে শুরুতে ঔপন্যাসিক 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' যে বাক্য দিয়ে শুরু করেছেন

তাতে করে একটি নব-দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রসঙ্গের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'মহেন্দ্রের' সঙ্গে 'বিনোদিনী'র বিবাহ প্রস্তাবের প্রসঙ্গে উপন্যাসের প্রথম বাক্যে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা পরবর্তী ঘটনাক্রমের দিকে খুব সহজে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাঠক ক্রমানুসারে জানতে পারেন 'বিনোদিনী'র অন্যত্র বিবাহের কথা এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যে কালানুক্রমিক বৈধব্য নিয়ে পিত্রালয়ে ফিরে আসার কথা। তবে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' দাম্পত্য জীবন ও দাম্পত্য-সমস্যাকে নিয়ে দীর্ঘদিনের গবেষণার ফসল ঘরে তুলতে চাইছেন তা উপন্যাসের সূচনা-লগ্নেই বোঝা যায়। উপন্যাসের সূচনা অংশটি আলোচ্য প্রসঙ্গে উদ্ধৃতি করে তুলে ধরা হল –"বিনোদিনীর মাতা হরিমতি মহেন্দ্রের মাতা রাজলক্ষ্মীর কাছে আসিয়া ধন্না দিয়া পড়িল। দুই জনেই এক গ্রামের মেয়ে, বাল্যকালে একত্র খেলা করিয়াছেন। রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে ধরিয়া পড়িলেন, 'বাবা মহিন, গরিবের মেয়েটিকে উদ্ধার করিতে হইবে। শুনিয়াছি মেয়েটি বড়ো সুন্দরী, আবার মেমের কাছে পড়াশুনাও করিয়াছে–তোদের আজকালকার পছন্দের সঙ্গে মিলবে"।[১৬] মহেন্দ্র তার মায়ের অনুরোধ রাখেনি, তখন সে পণ করেছিল জীবনে কোনদিন বিবাহ করবে না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তার মতিভ্রম কেটে যায় বন্ধু বিহারীর জন্য পাত্রী দেখতে গিয়ে। সে বন্ধুর জীবনের কোনরকম তোয়াক্কা না করে, নিজেই পাত্রী পছন্দ করে বসে। এবং প্রায় অনেকটা জোড় করেই 'আশা'কে বিবাহ করে। অবশ্য ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন তাদের নব-দাম্পত্য জীবন বেশ সুখের হয়ে উঠেছে; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তার মধ্যে দেখা যায় অশনি-সংকেত। কারণ তার মা 'রাজলক্ষ্মী' মনস্তাত্ত্বিকতার দ্বন্দ্বে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মাতৃ-ঈর্ষায় নববধুকে শিক্ষা দিতে অস্ত্র হিসেবে 'বিনোদিনী'কে বাড়িতে নিয়ে আসে। একদিকে মাতৃ-ঈর্ষা অন্যদিকে 'আশা'র অপরিণত মনোভাব 'মহেন্দ্র'কে ক্রমশ 'বিনোদিনী'র কাছাকাছি নিয়ে আসে। ঘটনাক্রমে 'বিনোদিনী' নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হতে থাকলেও, তার প্রবল ব্যক্তিত্ব ও মনন

বিহারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু 'বিহারী' তাকে আমল না দিলে পরবর্তীকালে সে 'মহেন্দ্রে'র প্রতি অনুরক্ত প্রকাশ করে কার্য সিদ্ধি করতে চায়। কিন্তু হিতে বিপরীত হয়ে যায়, যখন 'মহেন্দ্র' সম্পূর্ণরূপে 'বিনোদিনীকে' অধিকার করতে চায়। সে নিজের দাম্পত্য জীবনকে তুচ্ছ করে দূরে সরিয়ে রেখে ডেকে আনে চরম সর্বনাশ।

'চোখের বালি' উপন্যাসের অন্যতম চরিত্রদ্বয় 'মহেন্দ্র' ও 'আশার' দাম্পত্য সম্পর্কের কথাই নানা দৃষ্টিকোন থেকে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। আসলে সংঘাত দিয়েই উপন্যাসটির দাম্পত্য সম্পর্কের সূত্রপাত। যেদিন 'বিহারীর' জন্য পাত্রী নির্বাচন করতে গিয়ে 'আশা'র প্রতি 'মহেন্দ্রে'র মুগ্ধতা প্রকাশ পায়। এবং 'বিহারী'কে তুচ্ছ মনে করে 'আশা'কে বিবাহ করে, সেদিনই সংঘাতের বীজ বপন করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে 'বিনোদিনী'র আগমনেও নতুন নানারকম সংঘাতের সৃষ্টি হয়। অবশ্য এই সংঘাতের ফলে 'মহেন্দ্র' ও 'আশা'র দাম্পত্য জীবনে তেমন কোন প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়নি। প্রথম যেদিন 'বিনোদিনী'কে না দেখেই 'মহেন্দ্র' বিবাহে অসম্মতি ব্যক্ত করেছিল, সেদিনেই প্রথম অশান্তির বীজ বপন করা হয়েছিল। 'বিনোদিনী'র বৈধব্য প্রাপ্তির পর 'আশা'র সংসারে আসলে, পুরাতন সেই বীজকে মহীরুহে পরিণত করতে তার বেশী সময় লাগেনি। এই উপন্যাসে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' যেভাবে একটি দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙন-পর্বের চিত্ররূপ অঙ্কন করেছেন। তা ঔপন্যাসিক 'বঙ্কিমচন্দ্রে'র লেখা 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু উপন্যাসের শেষে ঔপন্যাসিক যেভাবে চরিত্রগুলিকে নিজের মনের অন্তর্নিহিত শোভনতাবোধ ও আত্মোপলব্ধির দ্বারা সংশোধিত করেছেন তাতে করে শেষ পর্যন্ত দাম্পত্য সম্পর্কের মান বজায় থেকেছে বলে মনে করা যেতে পারে। 'মহেন্দ্র' শেষপর্যন্ত বুঝতে পেরেছিল 'বিহারীর' সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বাভাবিক ভাবে জয়ী হয়েও পরাজয়ের গ্লানি বহন করতে হয়েছে তাকে। কেবলমাত্র আত্মাভিমান বজায়

রাখতে গিয়ে ‘আশার’ সঙ্গে পুতুল খেলার মতো দাম্পত্য সম্পর্কে জড়িয়েছিল, সেকথা বুঝতে পারে মহেন্দ্র। মরীচিকার বাসনায় সে পত্নীপ্রেম বিসর্জন দিয়ে পরনারীর প্রতি আসক্তি বসত দাম্পত্য জীবনে অশান্তি ডেকে নিয়ে আসে। প্রবল ঈর্ষার কারণে বৈধ-অবৈধ উভয় ক্ষেত্রে তার প্রণয়কে মরুভূমির উটপাখির মতো অসহায় করে তুলেছে। প্রবল ঝড়ে বালিতে নিজের মাথা লুকিয়ে রেখে তার বাঁচার প্রচেষ্টা নাস্যাৎ করে দিয়েছে। একমাত্র বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষাই তার প্রেমের সিংহাসন লাভের সোপান হত, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অন্ধ হয়ে দাম্পত্য জীবনের চরম সর্বনাশ ডেকে এনেছে ‘মহেন্দ্র’। ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ আলোচ্য উপন্যাসটিতে অসুখী-দাম্পত্যের চিত্র রচনা করার মধ্য দিয়ে কিভাবে সুখী-দাম্পত্য জীবনের বীজ বপন করা যায় সেই কথাই ব্যক্ত করেছেন। আলোচ্য প্রসঙ্গে ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ে’র একটি কথাকে প্রামাণ্য হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, তিনি লিখেছেন –

‘‘যাহাকে ভালোবাস, তাহাকে নয়নের আড় করিও না। যদি প্রেমবন্ধন দৃঢ় রাখিবে, তবে সুতা ছোট করিও। বাঞ্ছিতকে চোখে চোখে রাখিও। অদর্শনে কত বিষময় ফল ফলে’’।[১৭]

‘চোখের বালি’ উপন্যাসেও অনেক বিষময় ফলের জন্ম হয়েছে, কিন্তু সেগুলি ঔপন্যাসিকের বৌদ্ধিক চিন্তার কারণে বৃক্ষে পরিণত হয়ে উঠতে পারেনি। ‘চোখের বালি’ উপন্যাসের দাম্পত্য সমস্যা ধীর গতিতে সুখী দাম্পত্য জীবনে পরিণত হয়েছে। ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ শুধু দাম্পত্য সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করেছেন, তুলনায় তাঁর রচনায় সমাধানের পথ তেমনভাবে নেই। কিন্তু ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ শুধু সমস্যাকে তুলে ধরে কলম ছেড়ে দেননি, তিনি সমাধানের পথও চিহ্নিত করে তার ফলাফল বিশ্লেষণ করেছেন। ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ যেখানে মৃত্যু দিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ সেখানে মৃত্যুকে নয় জীবনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের' লেখা 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের সূচনায় 'বিমলার' আত্মকথার মধ্য দিয়ে দাম্পত্য সম্পর্কের বীজমন্ত্র আমরা শুনতে পাই। 'বিমলা' স্মরণ করে তার মায়ের কথা, তার মায়ের গায়েররঙ ছিল শ্যামলা, তার দীপ্তি ছিল পুন্যের। তার রূপ সৌন্দর্যের গর্বকে লজ্জা দিত। 'বিমলা' নিজেও তার মায়ের মতো হতে চেয়েছে। সে দেবতার কাছে বর চাইত, যেন মায়ের মতো সতীর যশ পায়। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' 'চোখের বালি' উপন্যাসে বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে বহিরাগত নারীর প্রণয় দেখিয়েছেন। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে বিবাহিত নারীর সঙ্গে বহিরাগত পুরুষের প্রণয় দেখিয়েছেন। অবশ্য এখানে দ্বিমত আছে 'বিমলার' সঙ্গে 'সন্দীপ'র সম্পর্ককে প্রণয় বলার যৌক্তিকতা নিয়ে। আলোচ্য উপন্যাসের পটভূমি যেহেতু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সেদিনের স্বদেশীকতা ও দেশপ্রেম। তাই স্বাভাবিক ভাবে ব্যক্তিপ্রেম সেখানে অনেকটাই নিষ্প্রভ থাকে বলে মনে করা যায়। কিন্তু চরিত্রের আধুনিকতার খাতিরে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' নারীর চির-পরিচিত ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনীকে এই উপন্যাসের ক্ষেত্রেও গ্রহণ করছেন। এর আগে 'বঙ্কিমচন্দ্রের' 'বিষবৃক্ষ', ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অথবা 'রবীন্দ্রনাথের' লেখা 'চোখের বালি' উপন্যাসে যেকথা বলা হয়নি, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে তাই যেন বলার চেষ্টা করলেন ঔপন্যাসিক। 'বিমলা', 'নিখিলেশ' ও 'সন্দীপের' মধ্য দিয়ে ত্রয়ী চরিত্রের আকর্ষণ-বিকর্ষণের সাহায্যে কাহিনী দ্রুত অগ্রসর হয়েছে। তবে দাম্পত্য জীবনের অন্বেষণে দেখা যায়, স্বাভাবিক শান্ত সংযত 'নিখিলেশ' তার পত্নীকে সমস্ত দিক থেকে স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে দেওয়ার পক্ষপাতী। 'বিমলাও' নিরুদ্বিগ্নভাবে স্বামীর সঙ্গে সুখী দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করছিল, কিন্তু হঠাৎ বাধা পেল স্বাদেশীকতার মোহে জড়িয়ে গিয়ে। 'বিমলাকে' স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত করার প্রচেষ্টায় 'সন্দীপ' একসময় নিজেই তার

প্রেমে পড়ে যায়। আবেগ উন্মত্ত হয়ে সে দেশ সেবকের ছদ্মবেশে 'বিমলার' মনে প্রবেশ করে, তাকে অস্থির করে তোলে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তার চাতুরী বজায় থাকেনি। 'নিখিলেশের' ধৈর্য ও মহানুভবতায় 'বিমলা' নিজেই একসময় ভুল বুঝতে পারে। এবং তৎক্ষনাৎ ঘৃণাভরে নিজের ভুল শুধরে নিয়ে স্বামীর আদর্শকে সামনে রেখে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' আলোচ্য উপন্যাসে 'বিমলা' ও 'সন্দীপ' চরিত্রের মধ্য দিয়ে স্বাদেশীকতার নামে ভণ্ডামিকে নগ্ন করে প্রকাশ করেছেন। অন্য দিকে দুই পুরুষের প্রতি প্রণয়ে আবদ্ধ হয়ে শেষে 'বিমলার' নিজেকে চিনতে পাওয়ার মধ্য দিয়ে সঠিক পরশ পাথর বেছে নেওয়ার কথাই বলেছেন। বহু মানুষকে দেখা ও চেনার পর যখন বিমলা নত মস্তকে 'নিখিলেশের' কাছে এসে দাঁড়ায়। এবং তারপর যে দাম্পত্য জীবন, তাতে হয়তো নিয়মানুবর্তীতা থাকে কিন্তু তেমনভাবে মননের কোন প্রাণ থাকে না। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আজও এমন কোন যন্ত্র আবিষ্কার হয়নি, যা দিয়ে 'নিখিলেশ' ও 'বিমলার' মতো মানুষের জীবনে আবার পূর্বের মতো ভালোবাসা ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব। উপন্যাস শেষে দেখা যায় 'নিখিলেশ' ও 'বিমলা' যেন একেবারে পরিশীলিত অন্যরকম মানুষ। তাদের কাছে ভালোবাসা পূজার সমুদ্রে মিশেছে, মিলিত হয়েছে জীবনের নব-আবিষ্কৃত সাগর-সঙ্গমে। একথা বলা যায় যে ভারতীয় ঐতিহ্যকেই লেখক আলোচ্য উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন। 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' যেখানে বিবাহিত পুরুষের অন্যনারীর প্রতি মুগ্ধতার কারণে দাম্পত্য সম্পর্কের সংকটের কথা বলেছেন 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' সেখানে বিবাহিতা নারীর জীবনে অন্যপুরুষের প্রতি আসক্তির কথা বলেছেন 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে। তিনি দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশকে জীবনের বিচিত্র রহস্যের অনিবার্য উপকরণ হিসেবে যেমন দেখলেন, তেমনি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কারকে অঙ্গীভূত করালেন। একইভাবে বিষয়টিকে কিছুটা

স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসে। এই উপন্যাসে কোন তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ নয়, ‘মধুসূদন’ ও ‘কুমুদিনীর’ বিবাহিতজীবনে যে সংকট ঘনিয়ে এলো তার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত-তন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের সংঘাতে সামাজিক পরিস্থিতি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কারণ উনিশ বছরের ‘কুমুর’ সঙ্গে পৌঢ় ‘মধুসূদনের’ বিবাহের ফলে দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি। ‘মধুসূদন’ ভালোবাসার ডোরে বেঁধে নয়, বাধ্য করে রাখতে চেয়েছে ‘কুমুদিনী’কে। কিন্তু ‘কুমু’ বাধ্যতায় নয় ভালোবাসায় বন্দী হতে চেয়েছে। নিজেদের মানসিক সংঘাত তৃতীয় ব্যক্তির প্রতীকে তাদের দুজনের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসটির স্বতন্ত্রতা এখানেই যে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কোন তৃতীয় ব্যক্তি না থাকা সত্ত্বেও অসুখী-দাম্পত্য সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার কারণকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’। তিনি জানতেন কেবল তৃতীয়পক্ষের উপস্থিতি কিংবা সামাজিক কোন চাপ নয়, দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মানসিক নৈকট্যই সুখী দাম্পত্যজীবনের মূল কথা। মানসিকতায় যদি কোন রকম জটিলতা থাকে তবে কোন রকম যোগাযোগ গড়ে ওঠে না দম্পতিদের মাঝে। এই সমস্ত কারণে তিনি হয়ত প্রেম ও বিবাহকে আলাদা করে ব্যাখ্যা করার পক্ষপাতী। ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসে তাই হয়ত তুলে ধরেছেন ঘড়ায় তোলা জল ও দিঘির জলের প্রসঙ্গ।

‘শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের’ উপন্যাসে প্রাথমিক ভাবে হিন্দু সনাতন ধর্মের প্রেক্ষিতে দাম্পত্য সম্পর্কের বিশ্লেষণ দেখা যায় বলে মনে হয়। তাঁর উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে হিন্দু রমণীরা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সতীত্বের সংস্কারকে অগ্রাহ্য করতে পারেননি। ‘পল্লীসমাজ’ উপন্যাসে ‘রমা’ একসময় ‘রমেশ’র মুখে ‘রানী’ ডাক শুনেও প্রাণপণ নিজেকে সংযত রাখর চেষ্টা করে। কারণ সে বিধবা, সমকালীন সমাজের প্রেক্ষিতে তার কোন কিছুর প্রতি

ভালোলাগা বা কারো প্রতি প্রণয় থাকতে নেই। বংশানুক্রমে মানুষের মধ্যে সঞ্চালিত হয়েছে 'জন্মান্তরবাদ' ও নর-নারীর বিবাহ কেন্দ্রিক নানারকম কুসংস্কার। যার প্রেক্ষিতে সেকালের মানুষের ধারনা ছিল –'একবার বিবাহ করলে নর-নারী জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়'। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও এই ধারণা থেকে কোন মতে হিন্দু বিধবা নারীরা বেরিয়ে আসতে পারেনি। যার ফলে শতগঞ্জনা অত্যাচার সহ্য করে সেযুগের নারীকে স্বামী'সংসার করতে হতো; অথবা বিধবা হয়ে সারা জীবন একাকিত্বে কাঁটিয়ে দিতে হতো। নারীদের জীবনের এরকম ভবিতব্যের কথা বেশী করে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'। তবে তিনি কিছুক্ষেত্রে সমাজ গর্হিত নিষিদ্ধ প্রেমকেই জয়যুক্ত করতে চেয়েছেন বলে মনে করা হয়। তাই বোধ হয় 'সরোজিনীর' সঙ্গে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশের আগে 'সতীশ' ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে 'সাবিত্রীর' ভালোবাসাকে স্বীকার করে নিয়েছে। কিংবা 'কিরণময়ীর' যে পরিণতি তা দাম্পত্য-সংকট নয়; কেননা তার স্বামী যতদিন জীবিত ছিলেন, সেই অসুস্থ স্বামীর শুশ্রূষায় তার কোন রকম ত্রুটি ছিল না। পরবর্তীকালে 'উপেন্দ্রের' প্রতি তার শ্রদ্ধাণ্বিত প্রেম প্রতিহত হয়ে একসময় 'দিবাকর'কে আশ্রয় করেছে। একইভাবে দাম্পত্য জীবনের সংকট তীব্রতর হয় 'অচলা' ও 'মহিমের' ক্ষেত্রে। যখন 'সুরেশ' ও 'মহিমের' মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তখন প্রতিযোগী 'মহিমের' সঙ্গে 'অচলার' বিবাহকেই ঔপন্যাসিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ বলে মনে করেছেন। কিন্তু দেখা গেছে শুধুমাত্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দিয়ে দাম্পত্য সম্পর্কের নিশ্ছিদ্র অবস্থানকে অক্ষত রাখা যায় না। তাই হয়তো একসময় 'মহিম' ও 'অচলার' দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙে যায়। 'অচলা' খেলারপুতুলের মতো একহাত থেকে আর একহাতে ঘুরতে থাকে দুজন পুরুষের মধ্যে। একসময় 'সুরেশের' জালে ধরা দিয়ে সমাজ অস্বীকৃত দাম্পত্য জীবনের দায় বহন করতে বাধ্য হয়। অবশ্য শেষে 'সুরেশের' মৃত্যু হলে

যন্ত্রণাময় দাম্পত্য সম্পর্কের হাত থেকে রক্ষা পায় ‘অচলা’। ‘গৃহদাহ’ উপন্যাস যেন দাম্পত্যহীন দুজন পুরুষ আর একজন নারীর বিচিত্র জীবনের কাহিনী। কারণ ‘অচলা’ জীবনের চলার পথে হয়তো কখনো দুজন পুরুষের মধ্যে একজনকেও ‘মনের মানুষ’ হিসেবে মেনে নিতে পারেনি।

‘শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ রচিত বেশীরভাগ উপন্যাসে বিধবা নারী চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তুলনায় সুখী-দাম্পত্য সম্পর্কের কথা তাঁর উপন্যাসে তেমন নেই বললেই চলে। কারণ অসুখী-দাম্পত্যের ফলে নর-নারীর জীবনের কি ভয়ঙ্কর পরিণতি হয়, তাই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন বেশীর ভাগ উপন্যাসে। তিনি পল্লীসমাজের মানুষদেরকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন, প্রত্যক্ষ করেছেন মানুষের ভিতর মহলের ঘাত-প্রতিঘাত। তাই হয়তো তাঁর উপন্যাসে সমকালীন সমাজের অবহেলিত নারীদের কথাই বেশী করে প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হয়। যারা শুধু সমাজকে দিয়েছে বিনিময়ে পায়নি কিছুই, যাদের চোখের জলের হিসেব কেউ রাখেনি কোনদিন, তাদের কথাই তিনি লিখেছেন। অবশ্য তিনি বিশ্বাস করতেন ভালোবাসার ও ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সমান হওয়া উচিৎ। তাই আমরা সহজে একটি কথা বলতে পারি, ‘বাঙালী হিন্দু বিধবা নারীর বহুবিধ যন্ত্রনা শরৎচন্দ্রের মনকে গভীর ভাবে ছুঁয়েছিল’। অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের তুলনায় তিনি সুখী-দাম্পত্য সম্পর্কে জড়িত চরিত্রের থেকে বিধবা নারী চরিত্র বেশী করে সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে ‘রমা’, ‘সাবিত্রী’, ‘কিরণময়ী’, ‘কমললতা’, ‘অপর্ণা’, ‘নীলিমা’, ‘সুরমা’ প্রমুখ চরিত্ররা যেন বাস্তব সমাজজীবনেরই প্রতিনিধিত্ব করেছে। যাদের মধ্যে অনেকেরই খুব অল্পবয়সে দাম্পত্য জীবনের ইতি টানতে হয়েছে; কোন ক্ষেত্রে সামাজিক কারণে নয়তো কখনো দৈবের ভ্রুকুটিতে। অবশ্য বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ বা কুলীন বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহের জন্য অসময়ে

নারীদের বৈধব্য বরণ করতে হয়েছিল। তাই স্বাভাবিক ভাবে ঐকবাক্যে বলা যায় যে, 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' মূলত অসম-দাম্পত্য সম্পর্কের ফলে সমাজে যে পরিণতি সাধিত হয়, সেই কথাই তিনি বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন বলে মনে করা।

'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়', 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' ও 'শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়'-এর পরে 'আশাপূর্ণা দেবীর' পূর্ববর্তী আরও কয়েকজন পুরুষ-ঔপন্যাসিকের নাম করা যায়, যাঁরা এই ধারার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। 'বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়', 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়', 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', 'জগদীশ গুপ্ত' প্রমুখরা সেসময়ের ব্যতিক্রমী ঔপন্যাসিক ছিলেন। 'বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়' রচিত উপন্যাসে মূলত ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়ে বসবাসকারী নর-নারীদের কথাই বিশেষত বর্ণিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। এই প্রসঙ্গে একটি উপন্যাসের বর্ণিত কাহিনী আলোচনা করা যেতে পারে, যেখানে প্রাসঙ্গিক দাম্পত্য সম্পর্কের কথা কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরা হয়েছে। উপন্যাসটির নাম 'অথৈ জল', উপন্যাসটির মূল চরিত্র 'শশাঙ্ক ডাক্তার'। যিনি গ্রামের পৈতৃক সম্পত্তি ও ডাক্তারী পেশার জন্য সুনাম ও পদমর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। গ্রামের প্রত্যেকটি সমস্যা ও ছোট-খাটো বিষয়ে দায়িত্ব নিয়ে সমাধান করতে তার তুলনা দ্বিতীয় কেউ নেই। অন্যান্য সব গ্রামের মানুষের মতো এখানেও সবাই নানা সংস্কার-কুসংস্কারের মধ্যে নিজেদের জড়িয়ে একে-অপরের সঙ্গে নানারকম বিরোধপূর্ণ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। গ্রামে বসবাসকারী 'রামপ্রসাদ' ও 'শান্তির' অবৈধ সম্পর্কের জন্য দারোগাকে ডেকে এনে সমাধান করে দেন 'শশাঙ্ক ডাক্তার'। অন্যদিকে 'হরিদাসের স্ত্রী'র সঙ্গে 'নিতাইয়ের' অবৈধ সম্পর্কের জেড়ে উত্তম-মধ্যম দিতেও ডাক্তার পিছপা হননি। আর তাই নিজের স্ত্রীর সঙ্গে তার মধুর দাম্পত্য

সম্পর্ক বজায় রেখে দিনযাপন করছিলেন। কিন্তু এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ‘শশাঙ্ক ডাক্তারের’ও একদিন পদস্খলন ঘটে, ষোল-সতেরো বছর বয়সের ‘পান্না’ নামে এক কিশোরী বাঈজীর প্রতি মোহের কারণে। যার মোহে পড়ে ডাক্তার নিজের দাম্পত্য জীবনের ইতি টেনে দিয়ে, নতুন প্রেমাস্পদকে নিয়ে পালিয়ে যায় কোলকাতায়। বাঈজী ‘পান্না’কে নিয়ে ডাক্তার জীবনের অথৈ জলে সাঁতার কাটার স্বপ্নে বিভোর হয়ে নিজের ডাক্তার হয়ে ওঠা সমাজকেই ভুলে যায়। কিন্ত সমাজের নিয়মের জালে বন্দী হয়ে পড়ে তার স্বপ্নের ঘোর কেটে যায়। পুলিশ এসে নাবালিকা ‘পান্না’কে তুলে নিয়ে গেলে ডাক্তার জীবনের দুকূল হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। উপন্যাসের শেষ এখানেই, অথৈ জলে ভাসার বাসনায় ডুবে মরা ছাড়া ডাক্তারের আর কোন পথ খোলা ছিল না। পতিতা বৃত্তি, নিষিদ্ধ প্রেম ও লোভ লালসার ছবি ‘বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়’-এর বেশ কয়েকটি উপন্যাসে পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি বিবাহিত জীবনের সমান্তরালে একটি রোমান্সের পরিবেশ তৈরি করে শুধুমাত্র ‘অথৈ জল’ উপন্যাসটি লিখেছেন বলে মনে করা হয়।

‘ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়’-এর মধ্যে একেবারে ভিন্ন প্রেক্ষিতে কলম ধরেছেন ‘তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়’। তিনি মূলত উপন্যাসে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যন্ত্রসভ্যতা ও কৃষিসভ্যতার মধ্যে বিরোধ তথা গ্রামীণ ও শিল্পাঞ্চলীয় নাগরিক সমাজের বিরোধ। অন্যদিকে জমিদার ও সাধারণ মানুষের সংস্কার ও মূল্যবোধ তিনি যথেচ্ছভাবে তাঁর উপন্যাসের পাতায় তুলে ধরেছেন। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা প্রায় অর্ধ-শতকেরও বেশী, স্বাভাবিক ভাবে সমস্ত উপন্যাসের বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। তাই বহু আলোচিত ‘ধাত্রীদেবতা’ উপন্যাসের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কের বিশ্লেষণ করে একটা সামগ্রিক রেখাচিত্র অঙ্কন করা যেতে পারে। উপন্যাসের মূল বিষয় হল ‘শিবনাথ’ ও ‘গৌরীর’

দাম্পত্য সম্পর্কের সূচনা ও দীর্ঘ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে সুস্থ-স্বাভাবিক পরিণতির লাভ করা। উপন্যাসের শুরুতেই বাল্যকালেই 'গৌরীর' বিবাহ হয় 'শিবনাথের' সঙ্গে। 'শিবনাথের' বড় হওয়ার প্রসঙ্গে যতটা সময় উপন্যাস এগিয়ে গেছে ততক্ষণ 'গৌরী' প্রায় নিষ্প্রভ। কালক্রমে ঘটনার ধারাবাহিকতায় 'গৌরী' একসময় শিবনাথের বাড়িতে আসে দাম্পত্য জীবন যাপন করার জন্য। দুজনের মধ্যে দিনের আলোর মতো মধুর সম্পর্কের মাত্রা বাড়তে থাকে। কিন্তু এই মধুর সম্পর্কের মাঝেও একসময় অসতর্কতায় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় 'শিবনাথের' জীবনের আদর্শ। সে যেভাবে দেশ ও দেশের মাটিকে জেনেছে বুঝেছে, 'গৌরীর' পক্ষে তা কখনো সম্ভব হয়নি। ফলে তাদের মাঝে একসময় দাম্পত্য জীবন যাপনের পদ্ধতির কারণে দূরত্ব তৈরি হয়, এবং শেষটায় ভুল বোঝাবুঝি পর্যন্ত এগিয়ে যায়। কিন্তু উপন্যাসের শেষে দেখা যায় তাদের ভালোবাসার মাঝে শিশুপুত্রকে কেন্দ্র করে সমস্ত বাক্-বিতণ্ডার অবসান হয়েছে। এভাবে দাম্পত্য সম্পর্কের ভিন্নতার মধ্য দিয়ে বহু উপন্যাসে 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়' প্রমাণ করেছেন– মতানৈক্য মানেই সম্পর্কের শেষ করে ফেলা নয়, মতের সাযুজ্য নিয়ে এসে সমাধান করাই মানবিকতার আসল কথা'। তবে একটি বিষয় তাঁর উপন্যাসের ক্ষেত্রে লক্ষ করার মতো, হয়তো তিনিই প্রথম নিম্নবর্গিয় সমাজের মানুষদের দাম্পত্য জীবনের বিশ্লেষণ করেছেন, যা অন্য ঔপন্যাসিকরা তেমনভাবে উল্লেখ করতে পারেনি বলে মনে করা হয়। 'আশাপূর্ণা দেবী' আলোচ্য প্রসঙ্গে লিখেছেন–

''বাস্তবিকই উদাসীন গ্রামবাংলার নিরক্ষর মানুষদের মধ্যেও যে সহজাত গভীর জীবনদর্শন, যা বংলার হাটে মাঠে গঞ্জে চাষাভুষো বাউল বোষ্টম ভিখারী ফকিরের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার ছন্দে ধ্বনিত, সেই জীবনদর্শনের ছাপ তারাশঙ্করের রচনায় সর্বত্র প্রতিফলিত। আতরবৌ, পদ্মবৌ, গাঁয়ের বোন স্বর্ণ, ঝুমুর দলের মেয়ে বসন, রীনা ব্রাউন। তারিনী মাঝি, বংশী ডোম, কবিয়াল

নিতাইচরণ– এই সব চরিত্ররা পাঠকের চেনা জগতের না হলেও লেখকের চেনা জগতের। সেই জগৎ থেকে আহরণ করে তিনি তাদের একটি একটি করে ধরে দিয়েছেন পাঠকের সামনে। তারাশঙ্করের সাহিত্যে এমনি বহুবিচিত্র চরিত্রের মিছিল''[১৮]।

আসলে হয়তো ঔপন্যাসিক 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়' প্রথম 'কাহার', 'ডোম', 'সাওতাল', 'মালো' প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন যাত্রার চিত্রাঙ্কন করেছেন বলে মনে হয়। আজীবন তিনি যে 'রাঢ় অঞ্চলে' বিচরণ করেছেন সেখানকার মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্যায় কাহিনী সুনিপুন ভাবে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন, এখানেই ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর সার্থকতা।

'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' রচিত উপন্যাসে অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের তুলনায় দাম্পত্য সম্পর্কের জটিল মনস্তত্ত্বের কথা বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। তাঁর উপন্যাসে কোথাও যেন চরিত্রগুলি কোন অদৃশ্য হাতের সুতোর টানে অভিনয় করে মাটির রঙ্গমঞ্চে সৃষ্টি করে 'পুতুল নাচের ইতিকথা', আবার কোথাও নারী পুরুষের ভালোবাসার জটিল পাঠক্রমে তৈরি করে 'দিবা-রাত্রির কাব্য'। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে 'কুসুম' ও 'মতির' নীড়হারা প্রেম ও যাযাবর জীবনের দাম্পত্যের চিত্র অন্যতম অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। 'কুসুমের' দাম্পত্য জীবনের সেরকম বিশেষ কোন চিত্র উপন্যাসে তেমনভাবে নেই। কিন্তু পাঠক বুঝে নিতে পারেন বিবাহিত 'কুসুম' কিসের আকর্ষণে 'শশীর' কাছে এসে দাঁড়ায়। 'কুসুম' নিজেকে উজাড় করে দিতে চেয়েছে 'শশীর' কাছে। 'শশী' সাহস করে সেই ভালোবাসা গ্রহণ করতে না পেরে নিজেকে বঞ্চিত করেছে। আর নিজের কাছেই জবাব দিতে 'কুসুম'কে বলেছে ''তোমার মন নেই কুসুম?''[১৯]

কেতুপুরের ‘কুবের’ মাঝির মতো গাওদিয়ার ‘শশী’ সাহস দেখাতে পারেনি। আর তাই উপন্যাস শেষে ভুল বুঝে প্রণয় প্রার্থনা করলেও তাকে তিরস্কার করে চলে গেছে প্রণয়ী ‘কুসুম’। সে কোনদিন সেভাবে দাম্পত্য জীবনের সুখ পায়নি, কিন্তু তার চারপাশের অনেক দাম্পত্য জীবনকে সে দেখেছে এবং উপলব্ধি করেছে। হয়তো সেই জন্যই সে শেষপর্যন্ত চিরযুবা হয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের’ উপন্যাসে দাম্পত্য জীবনে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশের মধ্য দিয়ে মানুষের সম্পর্কের নতুন একটা অভিমুখ দেখতে পাওয়া যায়। পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের মতো তিনি তৃতীয় কোন চরিত্রের মৃত্যু ঘটিয়ে অথবা তীর্থবাসী করে পরিণতি সাধন করেননি, অথবা পরিচিত কোন সামাজিক ছকে বেঁধে দেননি। তাঁর মতে কুলষিত সমাজের বাইরে অন্য কোথাও পুরুষ অথবা নারী পাবে তার কাঙ্খিত নারী অথবা পুরুষকে। তাই হয়তো খুব স্পষ্ট করে তিনি উল্লেখ করেন –“একা কুবের পাড়ি দিতে পারবে না ময়নাদ্বীপে, কপিলাও তার সঙ্গে যাবে”।[২০] এইরকম দাম্পত্য সম্পর্ক সৃষ্টিতে ঔপন্যাসিক হিসেবে ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের’ বিশেষ সার্থকতা লক্ষ করা যায়।

‘আশাপূর্ণা দেবী’র পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে যেরকম দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্ররূপ পাওয়া যায়, তার বিশ্লেষণে মোটামুটি ভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সমস্ত স্তরের ঔপন্যাসিকরা সমাজ কাঠামোকে গুরুত্ব দিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন। কখনো সামাজিক বৃত্ত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সাহস দেখাননি। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে সমাজে প্রচলিত রীতিকেও স্বীকার করে নিতে অস্বীকার করেছেন। বহুক্ষেত্রে বিধবাবিবাহ দেওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু ঔপন্যাসিকরা কৌশলে তা এড়িয়ে গেছেন। অবশ্য ঔপন্যাসিকরা দাম্পত্য জীবনের নানা সঙ্কটকে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে বিশ্লেষণ করেছেন বিভিন্ন উপন্যাসে। এখানেই তাঁদের ঔপন্যাসিক সত্তার জয় ঘোষণা করা যায়।

‘আশাপূর্ণা দেবী’ পূর্ববর্তীদের অনুসরণে উপন্যাস রচনা শুরু করলেও শেষের দিকে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উপন্যাসের চরিত্রের বিবর্তন ঘটিয়েছেন। পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের কাছে তিনি যেমন ঋণী, তেমনি পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকদের দিয়েছেন নতুনত্বের সন্ধান।

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<

তথ্যসূত্র

১) বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৭

২) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থনিলয়, সপ্তম সংস্করণ ২০০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা -৩৪০,

৩) ৬ মে তারিখে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি, শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র ভবনে সংরক্ষিত।

৪) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫৯

৫) মা, অনুরূপা দেবী, (১৯২০), কলকাতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮৩

৬) তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭৪

৭) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬৭

৮) নারীর লেখা, অনিলা দেবী, (ছদ্মনাম), যমুনা (ফাল্গুন সংখ্যা) ১৩১৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৫

৯) একটি পুরনো দিনের কাহিনী, আশাপূর্ণা দেবী, কথাসাহিত্য (১৯৫৭),পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪১

১০) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৭৫

১১) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬২.

১২) মেয়েদের কথা মেয়েদের কলমে, সুদক্ষিণা ঘোষ, মৌহারি, কলকাতা-৩২, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৫

১৩) পদ্মরাগ, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ, পৃষ্ঠা-৫৮

১৪) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৮১

১৫) আশাপূর্ণা দেবী জন্মশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, সম্পাদনা-আশাপূর্ণা দেবী মেমোরিয়াল কমিটি, আশাপূর্ণার কলমে পুরুষ : নারীর ত্রিপার্বিক অভিযাত্রা- ড. ছন্দা রায়, মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১৯৩.

১৬) চোখের বালি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিকাশ, গ্রন্থভবন, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫

১৭) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিষবৃক্ষ, বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র), বসাক বুক স্টোর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা-২৮৪

১৮) শিলীন্ধ্র – আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা, সম্পাদক- কমল মুখোপাধ্যায়, ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র, জানুয়ারি-মার্চ ২০১০, পৃষ্ঠা সংখ্যা -৩৩.

১৯) পুতুল নাচের ইতিকথা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬৩.

২০) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৫৭.

<<<<<>>>>>